





.গীর যাযাবর



১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত

গৌর যাযাবর

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী



স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

GOUR JAJABAR

A novel for children by Amarendra Chakravorty

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ISBN 978-81-86891-19-3

প্রকাশক

সর্বাণী চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন

কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: ২২৮০-৮৮১৮ ফ্যাক্স : ২২৮৭-৬৪৪৮

ই-মেল: books@swarnakshar.in

ওয়েবসাইট: ভ্রভ্রভ্র.ব্দভ্রaজ্ঞnaস্বদড়aজ.in

মুদ্রক

বর্ণনা

৬/৭, বিজয়গড়
কলকাতা-৭০০ ০৩২

তুম্মাকে আর তুষিকে

টুসকি মেরে উড়িয়ে দিয়ো ভয়-দেখানো ঘুঁষিকে



১

বুঝলি বুধা, .তাকে ছেড়ে যেতেই যা একটু কষ্ট, নইলে কবেই যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতাম । তা, যেতে আমাকে হবেই । তাছাড়া আর উপায় কী বল । চোখের জল না ফেলে একবেলা আমাকে ভাত খেতে দেখেছিস? আর সে কী ভাত! শিলাবৃষ্টির সময় মাঠ কুড়িয়ে ঠিক যেন একমুঠো শিল মুখে তুলছি । খিদেয়, একেকদিন — তোকে আর বলতে লজ্জা কী — একেক দিন ভগবানকে বলেছি, আর জন্মে যেন তোর মতো গোরু হয়ে জন্মাই; অন্তত খোল-ভুষিটা তো জুটবে । বুধা রে, যার মা চলে গেল, বাপ চলে গেল — যাক, কাল দোল, দোলের দিন কোথায় আর অজানা পথে মুখে কালি, পিঠে গাধার ছাপ মেখে ঘুরে মরব, কালকের দিনটা যাক, পরশু থেকে আমি আর এ গাঁয়ের ত্রিসীমানায় নেই । বুধা রে, দেখ, এই দেখ, এখনই আমার চোখে জল এসে গেছে । তুই, আর এই বটগাছ — তোরা দুটিই ছিলি এ গাঁয়ে আমার পিছুটান ।

বুধা বুঝুক না-বুঝুক, গৌরের যা কিছু কথা সব ওই গোরুর সঙ্গে । সাহাবাবুদের বড় ছেলের বাতিল গেঞ্জি ঝড়-খাওয়া কলাপাতার মতো গৌরের হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে । তারই এক ফালি তুলে ভালো করে চোখের জল মুছে গৌর ধরা গলায় বলল, পরশু থেকে তোরা কোথায় আর আমি কোথায়! কী করব বল, আমি যে নিরুপায় । কাল দোলের দিন আমি তেরোয় পড়ব । তাহলেই বোঝ, আদ্দেক জীবনই কেটে গেল সাহাবাবুদের গোলামি করে আর গালাগাল খেয়ে । আর যে কটা দিন আছি, একটু মনের মতো বাঁচতে ইচ্ছে হয় না? সন্ধের মুখে, নতুন জোছনায়, তকতকে দাওয়ায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত খেয়ে নিজের কাঁথাটিতে শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে না পারলে, বুধা তুই-ই বল, মানুষ বাঁচে!



বুধা ঘাস খেতে খেতে একবার গৌরের কাছে আসে, আবার ঘাস খেতে খেতেই দূরে সরে যায় । এবার যেই কাছে এসেছে, গৌর হাত বাড়িয়ে বুধার গলা ছুঁতে যাচ্ছিল, হঠাৎ

ঝিঁঝির ডাক শুরু হতেই লাফিয়ে ওঠে। সর্বনাশ! বটগাছের ছায়া লম্বা হয়ে একেবারে খালপাড় ছুঁয়েছে! পশ্চিমে ঘুরে দ্যাখে, তাল-সুপুরির সারির ফাঁক দিয়ে সুয্যিঠাকুর গনগনে চোখে চেয়ে আছে! গৌর তার মায়ের কাছে শুনেছিল, অস্তগামী সূর্য আসলে শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়ন। কীর'ম ধ্বক-ধ্বক করে দেখিসনি?

ভয় শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়নকে নয়, মা-বাবা বেঁচে থাকতে সঙের মেলায় সে অনেকবার শিবঠাকুর দেখেছে, শিবঠাকুরকে তার ভালোই লাগে। গৌরের আসল ভয় সাহাবাবুর রক্তচক্ষুকে। সন্ধে হতে চলল, এখনো গোরু গোয়ালে ওঠেনি, আজ নির্ঘাৎ গৌরের পিঠের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি হবে।

গৌর লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সব কটা গোরুকে এক জায়গায় করতে করতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাঁদ খালপাড়ের গাছপালা ছেড়ে আকাশে উঠে এসেছে। মনে হয় কাল নয়, আজই পূর্ণিমা। ভয়ে না সাহসে কে জানে, গৌর হঠাৎ পিছন ফিরে অস্ত-সূর্যকে জোড়হাতে নমস্কার করল। তারপর সামনের আকাশে চাঁদকে নমস্কার করল। তারপর বুধার গলা জড়িয়ে তার কপালে নিজের গালটি চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

যখন মুখ তুলল, সূর্য ডুবে গেছে, চাঁদ আরো জ্বলছে, বুধার কপালে গৌরের চোখের জল জোছনায় চিকচিক করছে।

গৌর এবার আর চোখ মুছল না। শুধু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, বিদায়, বুধা। বিদায়, বট! বলেই উলটো মুখে হন হন করে হাঁটতে লাগল। তার বুধা, তার বটগাছ, তার গ্রাম তার বুকের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে পিছনে ডাকছে কিন্তু সে আর ফিরে তাকাল না।

প্রথমে মাঠ, তারপর রেললাইন, তারপর সঙ্গী বলতে শুধু জঙ্গল আর চাঁদ। গৌর চলেছে তো চলেইছে, কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না। গ্রাম ছেড়ে আসার দুঃখ আর সাহাবাবুদের গৃহত্যাগের আনন্দ তাকে আজ ভারি আনমনা করে ফেলেছে। গৌরের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সে বেশ একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে।

হঠাৎ অনেক দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন চোখে পড়তেই গৌরের ঘোর ভাঙে, সে সতর্ক হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারল, দোলের আগের দিন ছেলেরা 'বুড়ির ঘর' পোড়াচ্ছে। তারও হাত সুড়সুড় করে উঠল, কিন্তু এখন কি তার উৎসবে মাতলে চলে? রাত বাড়বার আগে একমুঠো ভাত আর একটু শোবার ব্যবস্থা না করতে

পারলে মুশকিল। সারা রাত ধরে অচেনা জঙ্গলে হেঁটে বেড়ানো কোনো কাজের কথা না। পেটের মধ্যে তো এঁড়ে বাছুর দৌড়চ্ছে!

গৌর আগুনের ধার দিয়েই গেল না। ডাইনে ঘুরে জঙ্গল পেরিয়ে সামনেই দেখে একটা পুকুর। গ্রাম ছাড়বার সময় যে চাঁদটাকে সে নমস্কার করেছিল সেই চাঁদ দিব্যি এই পুকুরে নেমে পড়েছে। একদম জলের তলায়। পুকুর পাড়ের নারকোল গাছের সারিও উলটে গিয়ে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরের খুব ইচ্ছে হল, ঝাঁপিয়ে পড়ে বার কতক এপার-ওপার করে নেয়, কিন্তু সে ইচ্ছেও সে আপাতত তুলে রাখল। ওই দিকে ছেলেরা বুড়ির ঘর পোড়াচ্ছে, এইখানে পুকুর, তার মানে, যাক বাবা, একটা গাঁ তো পাওয়া গেছে! আর গাঁ যখন, কেউ না কেউ আশ্রয় দেবেই। পুকুর তো আর রাতারাতি পালাচ্ছে না!

গৌরের এইসব চিন্তা বা অনুমান কখনো ভুল হয় না। পুকুর ছাড়িয়ে এ-গাছতলা সে-গাছতলা দিয়ে কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল দূরে দূরে দশ বিশটা কুঁড়েঘর যে যার সামনের উঠোনে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে ঠিক যেন কোল পেতে বসে আছে।

গৌর সবচেয়ে কাছের বাড়িটার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধপধপে উঠোনে তারও ছায়া পড়ল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল, এ বাড়ির উঠোনের সঙ্গে তার ছায়াটার যেন অনেক দিনের জানাশোনা! ভারি মিশ খেয়ে গেছে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই যা ঘটল, গৌরের কান একেবারে খাড়া।

ঘরের মধ্যে হেঁড়ে গলায় কে একজন বলে উঠল, বাবা! পচাকে আমি পাকের ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে এলাম, আপনি লাঠি নিয়ে চলুন।

— ফের চুরি করেছে?

নিশ্চয় বাবার গলা। একদম মেঘের ডাকের মতো।

হেঁড়ে গলার লোকটা বলল, হ্যাঁ বাবা। সাঁঝ লাগতেই কার বাড়ি থেকে গামছা, সাবান আর একটা ফুল প্যান্ট ঝেড়ে এনেছে!

— ওর ভাগ্যে এবছর আর দোল খেলা নেই। আজই ওর শেষ দিন! তুই যা, আমি একটু তামাক খেয়ে আসছি।

গৌরের পা মাটিতে সেঁটে গেছে। সে দু-কান খাড়া করে তামাকের গুড়ুক-গুড়ুক শুনছে আর ভাবছে, এরপর কী? লোকটাকে সত্যিই কি মেরে ফেলবে না কি? এরকম

ঘটনার পর এ বাড়িতে আশ্রয় চাওয়াও তো সহজ নয় ।

— চোরপুত্রের জনক হওয়ার চেয়ে আমি আজ পুত্রহারা হব! প্রথমে ডান হাত পাত —

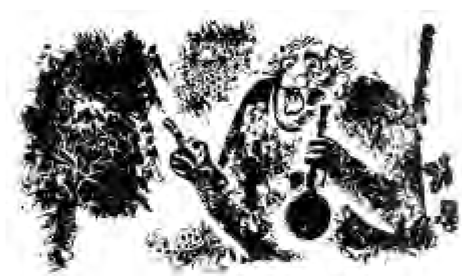
এ সেই মেঘের ডাক ।

এবারের গলা নিশ্চয়ই পচার । লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, এবারটা খালি ক্ষমা করুন বাবা । ও দাদা, হাতের বাঁধন খুলে দে, বাবার পায়ে ধরব । এবারটা আমায় ছেড়ে দিন । আর কখনো চুরি করব না । বাবা, বাবা গো, এ আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞে ।

— প্রতিজ্ঞা তো গত হপ্তায়ও করিছিলি । কচি, গত হপ্তায়ও ও ভীষ্মের নাম নেয়নি?

হেঁড়ে গলার লোকটা বলল (এ-ই তাহলে এনার বড়ছেলে, পচার দাদা) — না বাবা, সেবার যুধিষ্ঠিরের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞে করেছিল ।

— চোরের মুখে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের নাম! বল তোর জীবনের শেষ ইচ্ছে কী? একটু আবির খেলতে চাস তো দোলের আগেই খেলে নে । তোর আয়ু আর আধ ঘণ্টা । পচা কঁকিয়ে উঠল, এবারটা খালি ছেড়ে দিন বাবা । আর আমি চুরি করব না । ওরে দাদা, বাবার চরণ-দুটি একবার ছুঁতে দে ।



— কচি, সাবধান! বাঁধন না খোলে! তোর মা ঘাট থেকে না ফেরা অব্দি অপেক্ষা করতে হচ্ছে ।

বাবার শেষ রায় শুনে পচা এবার আকাশ ফাটিয়ে ডেকে উঠল — ও মা! মা গো! মা আমার! পচার এই গলা ছেড়ে মা ডাক শুনে গৌরের বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল ।

গৌর শুনল, বাবা বলছে — কচি, ঘর থেকে আমার হুঁকোটা এনে দে । তামাক পালটে দিস ।

এরপর শুধু পচার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর ওদের বাবার গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খাওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই ।

গৌর ভাবছে, নিজের গ্রাম ছেড়ে এসে এ কোন বিপাকে পড়া গেল! হঠাৎ পিছনে ভিজে কাপড়ের ছপ ছপ শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কাদের যেন মা — বোধহয় পচা কচিদের মা-ই হবে, উঠোনের এক ধার দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল ।

ওদিকে বাড়ির মধ্যে ঠিক তখনই তামাক খাওয়ার শব্দ থেমে গেছে আর পচা, বোধহয় মাকে দেখেই, নতুন করে কেঁদে উঠল — মা, মা গো! আর তোমায় মা বলে ডাকতে পাব না গো!

মায়ের গলা চিলের ডাকের মতো । গৌর শুনল, তিনি গলা চিরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন — ফের, ফের কচি, ঘরের খুঁটির সঙ্গে পচাকে বেঁধেছিস! ঘর যদি ভেঙে পড়ে তো আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন ।

— এঃ, চোরের মার বড় গলা! ন্যায় বিচারে নাক গলাতে এসো না বলছি বউ! পচাকে আজ আমি নিজের হাতে শেষ করে শ্মশানে নিয়ে যাব । তুমি ভিজে কাপড় ছেড়ে এসে ওকে শেষ দেখা দেখে নাও ।

গৌর কতক্ষণ আর সহ্য করবে, এবার সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে ওপাশের উঠোনে লাফিয়ে পড়ে পচার বাবাকে বলল, এইবারটা এনাকে ছেড়ে দিন, আমি এনাকে বাল্মীকি-আখ্যান গেয়ে শোনাব, দেখবেন তিনি আর কখনো চুরি করবেন না ।

পচার বাবার ধপধপে শাদা চুল-দাড়ি । বড় ছেলে কচির চুলও অর্ধেক শাদা । পচা ঘরের খুঁটির সঙ্গে গোরুর দড়ি দিয়ে বাঁধা । তার মাথার চুলে সবে পাক ধরেছে ।

পচার বাবা হুঁকো রেখে লাঠি তুলেছিলেন, গৌরকে পুরো এক মিনিট ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, পচার চুরির কথা তুই জানলি কী করে? মৃত্যুদণ্ডের কথাই বা তোকে কে বলল?

গৌর এই সুযোগে ধাঁ করে বুড়োকে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়ে বলল, আজ্ঞে, আমি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম ।



— কেন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলি?

— আজ্ঞে, আপনাদের এখানে এসেছিলাম একটু আশ্রয়ের খোঁজে।

— নাম?

— আজ্ঞে, গৌর।

— কী বললে বাবা? গৌর? দোলপুন্নিমের আগের রাতে তুমি বাবা গৌর এলে গরিবের কুঁড়েয়। ওরে কচি, ওরে পচা, এক্ষুনি জাল নিয়ে পুকুরে ছোট। বড় দেখে একটা কাতলা ধরে আন শিগগির। আহা রে, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

বলতে বলতে কচি-পচার মা গৌরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আসন পেতে তাকে বসিয়ে দিল।

পচা কান্না ভুলে বলে উঠল, দাদা আমার বাঁধন খুলে দে — বাবা, আপনি দাদাকে বলুন।

কচি-পচার বাবা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পচার বাঁধন খুলতে খুলতে বললেন, যা ব্যাটা, বেঁচে গেলি। ঘরে অতিথি এসেছে, তোর দণ্ড মকুব হয়ে গেল। এই যে বাবা, কই, তোমার বাল্মীকি আখ্যান ধরো দেখি।

— মা যে কচিবাবু-পচাবাবুকে মাছ ধরতে পাঠাচ্ছেন! কাজ-কম্মো মিটিয়ে, একেবারে দুটি শাকান্ন খেয়ে গান ধরলে হয় না?

গৌর অনেক দিন পরে প্রাণের সুখে পেট ভরে ভাত খেল। তারপর চতুর্দশীর খোলা উঠোনে চোখ বুজে বসে দস্যু রত্নাকরের মহাকবি হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত গেয়ে শোনাল। কথা ও সুর তার আগাগোড়া মুখস্থ। গলাটিও ভারি মিষ্টি।

গান শেষ করে চোখ খুলে দেখে সকলের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কেবল পচাবাবু বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, গান থামতেই ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ রগড়াচ্ছে। কী ভাগ্যি, গৌর ছাড়া আর কেউ দেখে ফেলেনি। ওরা ভেবেছে, পচাও বুঝি তাদের মতোই কাঁদছে।

গ্রাম ছেড়ে আসার সময়, পথে, গৌর একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলেছে, কারো বাড়িতেই সে একদিনের বেশি আশ্রয় নেবে না। পৃথিবীতে বাড়ি তো আর কিছু কম নয়।

আকাশের তারাদের চেয়ে বেশিই হবে হয়তো । তাছাড়া সে-ও তো আর লক্ষ লক্ষ দিন বেঁচে থাকবে না ।

পরদিন সকালে আশ মিটিয়ে পুকুর সাঁতরে, পেট ভরে পান্তা-টান্তা খেয়ে গৌর ছেলেদের দোলের রং এড়িয়ে সবে নতুন একটা জঙ্গলের পথ ধরেছে, হঠাৎ সামনের গাছ থেকে ঝুপ করে কে লাফিয়ে পড়ল । কে রে বাবা! আর কেউ না, পচা । মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে গৌরের কাছে এসে বলল, ভারি বুদ্ধি তোর । আমার দলে আসবি? আমি একটা ডাকাতের দল গড়ব ভাবছি ।

গৌর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, হঠাৎ আপনার এ দুর্মতি কেন?

— ছিঁচকে চুরি করে এ-বয়সে বাবার মার আর সহ্য হয় না ।

গৌরের ইচ্ছে হল, বলে, কাল আপনার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত ছিল । কিন্তু যতই রাগ হোক, একথা কি আর সত্যিই কাউকে বলা যায়! সে একটু দাঁত চেপে বলল, এসব বদ খেয়াল ছেড়ে মানুষের মতো বাঁচতে চেষ্টা করুন ।

পচা ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিয়ে বলল, ডাকাতি করে বস্তা বস্তা টাকা হলে তখন কত সুখ একবার ভেবে দেখেছিস?

গৌর তার নাকের সামনে থেকে পচার বিড়ির ধোঁয়া তাড়াতে তাড়াতে বলল, ধ্যুর! সন্ধেবেলা চাট্টি গরম ভাত খেয়ে নিজের কাঁথায় শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে পারার মতো সুখ আর পৃথিবীতে আছে নাকি! এত বয়েস হল আপনার, আপনি লোকটা কিন্তু বড্ড বোকা!

বলে গৌর আর দাঁড়াল না, তার চারপাশের পৃথিবী দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল । সন্ধে হবার আগে রাতের মতো একটু আশ্রয় আর একমুঠো ভাত ঠিকই হয়ে যাবে ।

২

দূর থেকে একটা বাড়ির সামনের দিকে চোখ পড়তেই গৌর দাঁড়িয়ে পড়ল । উঠোন তো না, যেন ভগবানের হোলিখেলা! হলুদ গাঁদা, চন্দন গাঁদা, মোরগঝুঁটির হুলুস্থুলু রঙে একেবারে ভেসে যাচ্ছে । উঠোনের এধার থেকে সরু একটা পথ উঠোনভরা রং চিরে ওধারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গেছে । পথের ওপর একটু দূরে দূরে একটা করে থান ইট পাতা ।

বাড়িটা দেখেই গৌরের ভারি আনন্দ হল, তার ওপর এই সরু পথ, চলতে গেলেই গায়ে-মুখে ফুলের টোকা লাগে! গৌর ইট থেকে ইটে জোড় পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার সামনে পৌঁছে দুষ্টুমি করে সুরেলা গলায় হাঁক পাড়ল — মা, দুটি ভিক্ষে পাই?

ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই । গৌর এবার আরো গলা তুলে বলল, বাড়িতে কেউ আছেন?

এবারও কেউ সাড়া দিল না । তার বদলে, গৌর এতক্ষণে খেয়াল করল, বাড়ির ভেতরে কে যেন ক্ষীণ গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে । অল্পবয়েসি বউ-মেয়ের গলা । কাঁদছে খুব চাপা স্বরে, যেন গলা খুলে কাঁদবার আর ক্ষমতা নেই ।

গৌরের মনের নাচন থমকে গেল । যদিও সন্ধে হতে এখনো খানিকটা বাকি, অন্য কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টা করার সময় চলে যায়নি, তবু তার খুব ইচ্ছে, আজকের রাতটা এ-বাড়িতেই কাটায় । বাড়িতে আর কোনো লোক নেই নাকি?

গৌর আরেকবার গলা তুলে ডাকতে যাচ্ছে, হঠাৎ ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, একটা বুড়ি লাঠি ঠুকে-ঠুকে এদিকেই আসছে । কাছে এসে দরজা পুরো না খুলেই বুড়িটা অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি আজ যাও বাছা ।

— আজকের রাতটা খালি থেকে যেতাম ।

— কে তোমাকে আজ একমুঠো রেঁধে দেবে বাবা! আমাদের বুক খালি হয়ে গেছে গো! বাড়ি শ্মশান হয়ে গেছে!

বলেই পরনের থান দিয়ে মুখ চেপে ধরে বুড়ি হু-হু করে কেঁদে উঠল ।

গৌরের মন সজাগ হয়ে যায় । সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে বুড়ির হাত ধরে বলল, কী হয়েছে, আমাকে খুলে বলুন ।

— আমার বড় নাতিকে সাপে কেটেছে । গাঁয়ের সব্বাই মিলে তাকে নিয়ে গেল গো, কলার ভেলায় চড়িয়ে গাঙে ভাসিয়ে দেবে ।

যত কথা, তত কান্না । বলতে বলতে বুড়ি বসে পড়ে — গত শীতেও ও-গাঙে কুমির দেখা গেছে । কত লোক দেখেছে । সেই গাঙে ওরে ভাসিয়ে দেবে! ও নবীন, নবীন রে!



সাপে কাটা গৌরের কাছে কিছু নতুন ব্যাপার নয় । তাদের গাঁয়ে সে অনেক সাপে-কাটা রুগি দেখেছে । বেশির ভাগই মরে যায়, আবার কেউ কেউ বাঁচেও । সে বুড়ির সামনে বসে পড়ে বলল, দংশন করেছে কখন?

— কাল রাতে বাবা । ওঝা এসে বাঁধন দিল, সারারাত কত ঝাড়ফুঁক করল, চুল ধরে কত ঝাঁকাল, দাদা আমার চোখ মেলল না । কী বলব বাছা, এই ফাগুনেই ওর বে দিয়েছিনু, কচি বউটা কাটা কলাগাছের মতো কেঁদে ভাসাচ্ছে!

গৌর শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, গাঙ এখান থেকে কদ্দূর? ওনারা কোন পথে গেছেন?

পথ বুঝে নিয়ে গৌর এক-এক লাফে তিন-চারটে করে ইট পেরিয়ে রাস্তায় পড়েই সোজা গাঙের দিকে দৌড় ।

গাঙের তীরে পৌঁছে এক জায়গায় পাশাপাশি তিনটে অশথগাছ আর তার তলায় মানুষের জটলা দেখে গৌর দাঁড়িয়ে পড়ল ।

লোকেদের কারো মুখে কোনো কথা নেই । মুখ নিচু করে তারা কলাগাছের ভেলা তৈরি করছে । তারই বয়েসি একটা ছেলে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ।

মাথা কাটা অনেকগুলো কলাগাছ পাশাপাশি সাজিয়ে শক্ত করে বেঁধে ভেলা বানানো হচ্ছে । সাপে কাটা ছেলেটিকে একটু দূরে অশথগাছের গোড়ায় শোয়ানো হয়েছে । তার শিয়রে কয়েকজন বসে আছে । একজনের মাথায় একটা ছাতা ।

যারা ভেলা বাঁধছে, গৌর তাদের কাছে গিয়ে বলল, ভেলা একটু বড় করে করুন, আমিও এনার সঙ্গে যাব ।

লোকগুলো হাতের কাজ থামিয়ে ভারি অবাক হয়ে গৌরকে দেখল । তাদের একজন বলল, তুমি কে বাবা? সাপে কাটা মানুষের ভেলায় কি জ্যান্ত মানুষ যেতে পারে?

গৌর ঝুঁকে পড়ে ভেলার বাঁধন দেখছিল, বলল, আমার নাম গৌর । ওনার নাম তো নবীন, আমি ওনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, এই বিপদের কথা শুনে ছুটে এসেছি । আমি এনার সঙ্গে থাকব ।

আরেকজন লোক বলল, সে কি সম্ভব? সে যে বড্ড কঠিন কাজ ।

কিন্তু কেউ একজন সঙ্গে না গেলে, নদীর জল আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় নবীনদা বেঁচে উঠলে কাউকে না দেখে তখন খুব মন খারাপ লাগবে । এত বড় গাঙে, একেবারে

একা — তাছাড়া ভাবুন, তখন যদি মাথার ওপর তারাভরা আকাশ থাকে?

একজন, একটু বুড়ো মতন লোক, ভেলা বাঁধার কাজে হাঁপিয়ে গিয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোমার কথাগুলোন ভালো, দামি কথা বটে, কিন্তু তুমি একা ওই ভেলায় নবীনের সঙ্গে যেতে পারবে?

— খুব পারব। আপনারা কিছু চিঁড়ে-মুড়ি সঙ্গে দেন।

— চিঁড়ে-মুড়ি দেব, খই-মুড়কি দেব, অসময়ের পাটালিও খানকতক দেব, তা বাদে জল খাওয়ার ডাবও দেব এক কাঁদি।

ছাতা-মাথায় লোকটা এগিয়ে এসে গৌরের কথা শুনছিল, বলল, আমার ছাতাটাও দেব, রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় দিয়ো।

যে লোকটা চিঁড়ে-মুড়ি-পাটালির কথা বলেছিল, সে এবার ছাতা-মাথায় লোকটাকে দেখিয়ে গৌরকে বলল, এ হল গিয়ে নবীনের জ্যাঠা। বাবাই বলতে পারো। ছোট্টবেলা থেকে নবীনকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। তা, হ্যাঁ বাবা, তোমার বাপ-মা তোমাকে যেতে দেবে?

— বাপ-মাকে বুকে নিয়েই বেরিয়েছি। তারা এখন স্বগ্যে। তাদের মুখ দুখানি আমি রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবি। ভেলায় বসেও ভাবব।

— আহা, কথাগুলোন যেন জিরেন কাটের রস! কথা তো নয়, মনে হয় যেন শান্তিজল ছেটাচ্ছে গো!

হাতে হাতে ভেলা তৈরি হয়ে গেল। গৌর বসলে একদিকে ভার পড়ে যাতে ভেলা না ডুবে যায়, একটা ভাঙা নৌকো কেটে তারও ব্যবস্থা করা হল। একজন গিয়ে ভেলার এক মাথায় দুটো কলাগাছের ফাঁকে খোলা ছাতার বাঁটের দিকটা গুঁজে দিল। গ্রামের লোক চিঁড়ে, মুড়ি, খই-পাটালি, তিলের খাজা, ডাবের কাঁদি বয়ে এনে ভেলায় সাজিয়ে রাখল। সঙ্গে কলাই-করা থালা, গেলাস, ডাব কাটার ছুরি, আর একটা দাঁড়। সবশেষে জোয়ান চেহারার কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে নবীনকে শুইয়ে দিল ভেলার ওপর। গৌরের বয়েসি ছেলেটা প্রথম থেকেই কাঁদছিল, নবীনকে ভেলায় শোয়াচ্ছে দেখে 'ও দাদা গো' বলে হুড়মুড় করে নদীর পাড় ভেঙে নীচে নেমে এসে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কান্নার সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

গৌর ততক্ষণে ভেলায় উঠে বসেছে। যারা জলে নেমে ভেলার মাথার দিকটা ধরে ছিল তারা হঠাৎ 'জয় মা বিষহরি, জয় মা মনসা' বলে জোরে ধাক্কা দিয়ে ভেলাটাকে

গাঙের ভেতরের দিকে ঠেলে দিল । নবীনের জ্যাঠাও জলে নেমে এসেছিল, গলা তুলে গৌরকে বলল, বাবা গৌর, নবীনকে দেখো বাবা, বেঁচে উঠলে ফিরিয়ে এনো । — ও বাবা নবীন, তুই কোথায় চললি বাপ!

ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা স্রোতের মুখে অনেকটা দূরে চলে এসেছে, হঠাৎ গৌর দেখল, নবীনদার ভাই ভেলা লক্ষ করে সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে আসছে ।

পাড়ের লোকেদের চোখে পড়তেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, ও প্রবীণ, প্রবীণ! ফিরে আয়, ফিরে আয়! প্রবীণ —

প্রবীণ ফিরছে না দেখে দুজন লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব সাঁতারে প্রবীণের কাছে এসে ভেসে উঠল, তারপর দুজনে মিলে প্রবীণকে জাপটে ধরে জোর করে তাকে ডাঙার দিকে নিয়ে চলল ।



গৌর এতক্ষণে দাঁড়টা জলে নামিয়ে ধীরে ধীরে ভেলা বাইতে লাগল । পাড়ের লোকজন, ঝোপঝাড়, কুঁড়েঘর, অশথগাছ এক পা এক পা করে পিছোতে পিছোতে খুব দূরের একটা দেশ হয়ে গেল । ততক্ষণে গাঙের জল শেষবারের মতো রাঙিয়ে, তারপর রাঙা জল কালো করে অস্তগামী সূর্যও ঝাপসা অশথগাছগুলোর আড়ালে চলে গেছে ।

গৌর বসেছে নবীনের পায়ের দিকে, খোলা ছাতাটার নীচে । নবীনের কত আর বয়েস, খুব বেশি হলে গৌরের চেয়ে পাঁচ-ছবছরের বড় । মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সারাদিন হই-হুল্লোড় করে নবীনদা যেন না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ।

গৌরের মনে ভয়ডর বলে কিছু নেই, এক সাহাবাবুকে ছাড়া । তা সে-ভয় কবেই শেষ হয়ে গেছে । গাঙের জল ছলাৎ ছলাৎ করে গৌরকে ডাকতে ডাকতে কোথায় কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে গৌরের কোনো ভয়-ভাবনা নেই । অন্ধকার আকাশে রাক্ষসের বাঁকা একটা দাঁতের মতো একফালি চাঁদ দেখতে দেখতে গৌর ভাবল, গান ধরলে কেমন হয়? এতক্ষণ ধরে একদম একা, কথা কইবার দ্বিতীয় কোনো লোক নেই, এ ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার । কথাটা মনে হতেই গৌর বাঁ হাতের তালুতে একটা কান চেপে সুর করে গাইতে শুরু করল —



উচ্ছে তিতা, নিমের পাতা, আরো যে কত তিতা
রাবণ রোজ দুবেলা দেয় — দাঁতে না কাটেন সীতা ।
শ্রীরাম আমার স্বামী গো, আমার জনকরাজা পিতা
আছোলা বাঁশে, শিয়ালকাঁটায় বানাচ্ছে তোর চিতা ।
দাঁত কিড়মিড় করে রাবণ, বড্ড অহংকার!
রাজার দোষে দেশ ডোবে হায়, ডুববে গো লংকা ।
লংকাদেশের কলঙ্ক এই মস্ত লোভী রাবণ

লোভ করেছে, লোভের কুফল করেনি অনুধাবন।

গৌর বিভোর হয়ে গান গাইছিল, হঠাৎ কীসের একটা ফরফর শব্দে তার ঘোর ভেঙে গেল। গান থামিয়ে কান খাড়া করে শব্দটা শোনবার চেষ্টা করল। নবীনদা বেঁচে উঠল না তো? খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে সে নবীনের মাথার কাছে গিয়ে তার নাকের কাছে কান পাতল — কোনো শব্দ নেই। হাতের উলটো পিঠ কপালে রেখে পরীক্ষা করল, একটামাত্র আশার কথা, শরীরে এখনো সামান্য তাপ আছে।

শব্দটা আরেকবার হতেই গৌর ভেলার ডানদিকে মুখ ফেরাল। শব্দটা ওইদিকেই হচ্ছে। আবছা অন্ধকারেও গৌর দেখল, ভেলার সঙ্গে বেশ খানিকটা কচুরিপানা লটকে গেছে। ভেলার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে চলেছে। কচুরিপানার মধ্যে বিঘতখানেক লম্বা একটা মাছ আটকা পড়ে গিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করে উঠছে — শব্দটা তারই।

গৌর নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড় দিয়ে ঠেলে মাছটাকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর কচুরিপানার ঝাঁকটাকে সরাতে সরাতে গুনগুন করে গাইতে লাগল —

হলেই তুমি তোমার দেশের মালিক

পুরবে খাঁচায় সামনে পেলেই শালিক?

ওরে ও রাবণরাজা ভাই —

বড্ড তোমার খাঁই।

— কে যায়? পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব — নৌকো ভেড়াও! নাম বল, নিবাস বল!

পাড়ের অন্ধকার ঝোপঝাড় থেকে ছিটকে আসা বাজখাঁই গলার হুংকারে গৌর প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপর মাথাটা পরিষ্কার হতে জোরে চেঁচিয়ে বলল, গৌর যায় আর যায় সাপে-কাটা নবীনের শবদেহ! আপনারা কে বটে?

— তোর যম রে ব্যাটা! তীরে নৌকো ভেড়া, শয়তানের পো!

বলতে বলতে ঝোপঝাড় ভেঙে নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল পাঁচ-ছজন পুলিশ। গৌর দূর থেকেও দেখতে পেল, একজনের হাতে বাগানো বন্দুক, তার মাথায় টুপি। সে একটু চেঁচিয়ে কিন্তু ক্রোধহীন গলায় বলল, আপনারা খামোখা মুখ খারাপ করছেন কেন গো?

স্রোত ঠেলে ডাঙা ধরতে একটু তো সময় লাগবে । তাছাড়া এ হল গিয়ে কলাগাছের ভেলা!

— কথার বহর দেখেছেন স্যার! শবদেহ-টেহ বাজে কথা, মনে হয় সে-ই, শবদেহের ছদ্মবেশে পালাচ্ছে!

— নৌকোয় পালালে পাছে সন্দেহ হয় তাই ভেলায় চড়েছে! পাড়ে লাগামাত্র কয়েকজন মিলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘিরে ফেলবে । সাংঘাতিক চীজ!

পুলিশের কথাগুলো গৌর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে । ভালো ঝামেলায় পড়া গেল যা হোক! সাপের কামড়ে মরে যাওয়া মানুষকে ভাবছে শবদেহের ছদ্মবেশ! বলিহারি বুদ্ধি!

ডাঙায় ভেলা ঠেকতেই দুজন সেপাই উবু হয়ে বসে ভেলাটা দুহাতে খামচে ধরল । অন্য দুজন জলে নেমে ভেলার ওপাশটা ধরে আরো খানিকটা পাড়ের দিকে ঠেলে দিল । বন্দুকওলা পুলিশটা নবীনদার গলার কাছে বন্দুক ধরে ঝুঁকে পড়ে তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল ।

— পুলিশ দেখে মটকা মেরে পড়ে আছে স্যার! কুঁদো দিয়ে দিন না একটা —

জলে দাঁড়ানো সেপাইটার কথা শেষ হবার আগেই গৌর বলে উঠল, খবরদার! একটা মরা মানুষের গায়ে বন্দুক ছোঁয়াবার আগে, এই নিন, আমাকে মারুন!

বলে সে নবীনের গলার কাছে বাগানো বন্দুকের নলটা এক হ্যাঁচকায় নিজের বুকের সামনে টেনে নিল ।

— বড্ড তোর সাহস দেখছি! বিষ্টু দারোগার বন্দুক ধরে টানিস! এ তোর গুলতি ভেবে বসলি নাকি? বলেই দারোগাবাবু প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়লেন — নাম কী তোর? থাকিস কোথায়? একটি চড়ে তোমার বাপের নাম আমি ভুলিয়ে দিতে পারি জানিস?

গৌর এত ঝামেলার মধ্যেও ফিক করে হেসে ফেলে বলল, তা আবার কেউ পারে নাকি! ছেলেকে বাপের নাম কখনো ভুলিয়ে দেওয়া যায়? যাক সেকথা । আমার নাম গৌর । এনার নাম নবীন । লেখাপড়া তো কিছু শিখিনি বাবু, খালি একটা জিনিসই শিখেছি — এই পৃথিবীতে ভয় করবার মতো কিচ্ছু নেই ।

— ও! কথাটা একবার শুনলেন স্যার? বলুন তো থানায় নিয়ে গিয়ে —

দারোগা কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আবার হুঙ্কার ছাড়লেন — নিবাস?

তারপরই ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতের উলটো পিঠটা নবীনের নাকের কাছে ধরে রইলেন ।

গৌর বলল, আমার নিবাস নেই । আজ এ গাঁয়ে কাল ও গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই । কেউ দুটি ভাত দিলে খেয়ে তাদের দাওয়ায় শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি । এনার নিবাস রসপাটালি গাঁ । এনাকে সাপে কেটেছে । গাঁয়ের লোক ভেলায় করে গাঙে ভাসিয়ে দিচ্ছে দেখে আমি এনার সঙ্গী হলাম । যদি বেঁচে ওঠে —



— না হে, এতক্ষণ কেউ নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে না — চলো । বলে দারোগাবাবু হাতের বন্দুক কাঁধে ঝোলালেন ।

যে দুজন সেপাই জলে নেমেছিল, তাদের একজন বলল, শুনেছি স্যার, লোকটার ছদ্মবেশ ধরার অদ্ভুত ক্ষমতা । স্যার! এ কান দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে না তো?

— তা, তুমি যেমন ভুঁড়ি দিয়ে ভাবছ তাতে ও-ছেলেটাও কান দিয়ে নিশ্বাস নিতে পারে বইকি । চলো হে, ফের ঘাপটি মারা যাক । যাবে কোথায়? এ পথ ছাড়া আর অন্য রাস্তা নেই । আমার কাছে রিপোর্ট আছে, সব দিক থেকে তাড়া খেয়ে ছোকরা নদীর দিকেই এসেছে ।

সবাই চলে যাচ্ছে দেখে গৌর বলল, ভেলাটা একটু ঠেলে দিয়ে যান । নইলে সারারাত এই ডাঙাতেই পড়ে থাকতে হবে । সাপে-কাটা রুগি — এনার এখন নদীর স্নেহ, হাওয়ার আদর দরকার ।

— যা, ঠেলে দিয়ে আয় । বলে দারোগাবাবু ওপরের ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন ।

গৌরের মনটা একটু খিঁচিয়ে ছিল । কতগুলো বোকা লোকের জন্য নবীনদা এতক্ষণ নদীর ঢেউ পেল না, ঝাপটা পেল না, যদি কোনো ক্ষতি হয়! দাঁড় বাইতে বাইতে সে ভাবল — দূর ছাই, মনের বিরক্তিকে লংকা-ছোলা দিয়ে পোষবার কী দরকার! তার চেয়ে গান গেয়ে বনের পাখির মতো উড়াল দিই! কথাটা মনে হতেই সে কান চেপে, চোখ বুজে, গলা তুলে গান ধরল —

হলেই তুমি তোমার দেশের মালিক
পুরবে খাঁচায় সামনে পেলেই শালিক?
ওরে ও রাবণরাজা ভাই —
বড্ড তোমার খাঁই ।
বলদ লাঙল নিয়ে মাঠে গেলেন জনকরাজ —
জমি চষে পেলেন সীতা আজ ।
ডাগর ডোগর হলেন সীতা,
রামকে পেলেন মনের মিতা,
কোথার থেকে এলি রে তুই লংকাদেশের মালিক?

সীতা কি তোর খাঁচায় পোরার শালিক?
সীতা হলেন সবুজ ফসল তাজা
চাষ করেছেন পিতা জনকরাজা —
আপনি বটে কে?
মাঠের ফসল উপড়ে নিলে থাকবে না রক্ষে!
ওরে ও রাবণরাজা ভাই —
বড্ড তোমার খাঁই ।

ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আর শীতল বাতাসে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে ভাবতে গৌর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি । চোখে ভোরের কিরণ লাগতেই ধড়ফড় করে উঠে বসল । ভোরের আলোয় নদীর জল যেন রামায়ণ গানের বোল ধরেছে ।

হঠাৎ নবীনের মুখে চোখ পড়তেই গৌরের বুকটা আনন্দে ধ্বক করে উঠল । নবীনদার দুচোখ মেলা । সে এক দৃষ্টিতে গৌরের দিকে চেয়ে আছে । গৌর তার চেনা নয় ঠিকই, তবু তো একজন মানুষের মুখ দেখল!

গৌর হেসে বলল, নবীনদা, আমার নাম গৌর । তুমি প্রবীণও বলতে পারো । তোমার খিদে পায়নি?

নবীন ক্ষীণ গলায় ধীরে ধীরে বলল, আমার কী হয়েছে? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

— তোমাকে সাপে কেটেছিল, ভয় নেই, তুমি বেঁচে গেছ । চলো, তোমাকে তোমার রসপাটালি গাঁয়ে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিই । সেখানে তোমার জ্যাঠা, তোমার ঠাকুমা, তোমার বউ, তোমার ভাই প্রবীণ, তোমার গাঁয়ের লোকজন — সবাই তোমার পথ চেয়ে বসে আছে ।

সামনেই একটা ঘাট দেখে গৌর অনেক কসরৎ করে ভেলাটাকে ঘাটের কাছে লাগাল । একটা লোক দুহাতে নাক-কান চেপে চোখ বুজে ঝপঝপ করে ডুব দিচ্ছিল, সে দম নেবার জন্য একবার থামতেই গৌর বলল, এটা কোন গাঁ বলতে পারেন?

— গাঁ? এ হল গিয়ে বৈদ্যবাটি । নিমাইতীর্থ ঘাটের নাম শোনোনি?

লোকটা আবার ডুব দেবার আগে নাক-কান টিপতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভেলার দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, এ আবার কোথাকার মহারাজ রে? একেবারে ভেলায় চড়ে দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছেন! সাপে-কাটা রুগি নয় তো?

গৌর দেখল সাপে-কাটা রুগি শুনেই নবীনদার মুখ কালো হয়ে গেল, সে তক্ষুনি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে বলল, সাপে-কাটা রুগি হতে যাবে কেন, ভেলায় বুঝি আর কেউ চড়ে না — আমরা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। — এসো, নবীনদা, এবার একটু কিছু মুখে দাও। তিলের খাজা খাবে, না খই-পাটালি মেখে দেব? গুড়ের স্বাদ যা হয়েছে না — রাজভোগ কোথায় লাগে?

নবীন উঠে বসবার চেষ্টা করতেই গৌর এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। তারপর জলের দিকে অল্প ঝুঁকিয়ে তার চোখে-মুখে আঁজলা ভরে জলের ঝাপটা দিতে দিতে গলা নামিয়ে বলল, ওর কথা গায়ে মেখো না নবীনদা। ওধরনের লোক নিজেও কখনো আনন্দ পায় না, অন্যকেও আনন্দ দিতে পারে না। তুমি হাঁটতে পারবে তো? দাঁড়াও, আগে একটা ডাব কেটে দিই। তারপর গুড় দিয়ে খই মেখে দেব। আমি রাতে খেয়েছি, একদম জয়নগরের মোয়া।

গৌর অনেকক্ষণ ধরে নবীনের চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিজের ভিজে হাত-দুটো নবীনের কানের পেছনে, ঘাড়ে, চুলের গোড়ায় বারকতক ঘষে দিল। তারপর বলল, এবার নদীর জলে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নাও। উপোস করে আছ তো, না হলে এক চক্কর সাঁতারও দিতে পারতে।

নবীনের আচ্ছন্নভাবটা কেটে গিয়েছিল, বলল, আমাদের গাঁয়ে তোমাকে কখনো দেখিনি তো?

গৌর জলে ধোওয়া কলাইয়ের থালায় গুড় দিয়ে খই মাখতে মাখতে বলল, দেখবে কী করে? কালই তো প্রথম তোমাদের বাড়ি গেলাম। তোমার ঠাকুমার মুখে সব কথা শুনেই গাঙপারে দৌড়ে এসেছি। তখন তোমার ভেলা বাঁধা হচ্ছে। নাও, একটু হাত চালিয়ে খেয়ে ঘাটে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এদিককার কাজ শেষ করে আসছি।

নবীন তৃপ্তি করে গুড়-খই শেষ করে আরেকটা ডাব খেয়ে ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসল। যেসব খাবার জল লেগে নষ্ট হয়নি, গৌর বেছে বেছে সেগুলো তার কোঁচড়ে বেঁধে নিয়েছে। ছাতাটা উলটো করে ধরে তার মধ্যে নিল থালা, গেলাস, গেলাসের মধ্যে ছুরি। তারপর হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরে ভেলাটাকে জলে ঠেলে দিয়ে সে গুনগুনিয়ে দু-কলি রামায়ণ গাইতে গাইতে নবীনের পাশে এসে দাঁড়াল।

— কী গো নবীন দা, হাঁটতে পারবে তো? তাহলে চলো, এবার বাসরাস্তার দিকে যাই । একটু খোঁজ-খবর নিতে হয় । নিদেন গরুর গাড়ি তো পাওয়া যাবে!

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গৌরের মুখে খই ফোটে — তোমাদের গাঁয়ের দিকের বাস পেলে তুমি উঠে পড়বে, পয়সা চাইলে আধখানা পাটালি দিও, ঠিক তোমাকে গাঁয়ে পৌঁছে দেবে ।

— তুমি যাবে না? তোমাকে আমাদের বাড়ি যেতেই হবে ।

— এবার না । পরে একবার যাব নিশ্চয়ই । তোমাদের উঠোনটা ভারি সুন্দর!

নবীন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তা বললে হয়? আজই তোমাকে যেতে হবে । আমার সঙ্গে ।

— আজ না নবীনদা । আমি গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি পৃথিবীটা একটু ঘুরে দেখব । কতরকম গাঁ, কত রকম ঘরবাড়ি, কত রকমের মানুষজন — না দেখলে চলে!

একটু থেমে কী ভেবে গৌর আবার বলল, জীবনে কত সুখ বলো দিকিন নবীনদা! এই যে তুমি আবার কথা বলছ, তোমাকে দেখে আমার বুকের মধ্যেটা আনন্দে গুরগুর করছে!



বৈদ্যবাটি চৌমাথায় এসে তারা বাসরাস্তা পেয়ে গেল। একটা চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানল, এটা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। লোকটার সঙ্গে কথা বলে আরো জানা গেল, এখান থেকে দু নম্বর বাস ধরে রসপাটালির দিকে যাওয়া যায়, তবে বাস গ্রাম থেকে একটু দূরে বড় রাস্তায় থামে।

নবীন বলল, সে জানি। আমাদের বাড়ি বাসরাস্তার কাছেই, আধ ঘণ্টার হাঁটাপথ।

গৌর কোঁচড় খুলে আস্ত একটা পাটালি বের করে নবীনের হাতে দিয়ে বলল, আধখানায় রাজি না হলে পুরোটাই না হয় দিয়ে দিও। তোমার এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।

বলে সে আর দাঁড়াল না। নবীন কিছু বোঝবার আগেই সে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে এস এন মল্লিক রোড ধরে সোজা হাঁটা লাগাল।

নবীনের শরীর এখনো খুব দুর্বল, তবু তার মনে হচ্ছিল দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে গৌরকে দুহাতে জাপটে ধরে বলে, তুমি যাবে না!

পাঁচ-সাত মিনিট হেঁটে সামনেই পিচবাঁধানো চওড়া রাস্তা পেয়ে গৌর দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা লোক রাস্তার এধারে বসে আখ বিক্রি করছিল, গৌর তাকে জিজ্ঞেস করল, এ রাস্তার নাম কী গো দাদা?

— দিল্লি রোড।

— রাস্তাটা দিল্লি গেছে নাকি?

— না হলে আর দিল্লি রোড নাম হয়? এ কি মানুষ নাকি যে কানা ছেলের নাম রেখে দিলে পদ্মলোচন!

— দিল্লি কোনদিকে? বাঁদিকে, না ডানদিকে?

— বাঁয়ে কলকাতা, ডাইনে দিল্লি।

গৌর ডানদিকে ঘুরে দিল্লি রোড ধরে এগোতে লাগল। দেখাই যাক না, কত দূর যাওয়া যায়! ভারি মজা তো, এই রাস্তা ধরে হেঁটে গেলেই দিল্লি?

গৌর যে দিল্লি যাবার কথা ভাবছে তা কিন্তু নয়। হাঁটতে হাঁটতে দিল্লি পৌঁছে যাওয়া যায় ভেবেই তার মজা লাগছে। রাস্তার দুধারে খুব গাছপালা, চাষের খেত, পুকুর। একটা

তুলসীতলাও চোখে পড়ল । যাক, মানুষের ঘরবাড়ি যখন রয়েছে তখন আর ভাবনা কী!

গৌরের মনটা আজ ভোর থেকেই আনন্দে ভরে আছে । দাদাকে হঠাৎ বাড়ির দিকে হেঁটে আসতে দেখে প্রবীণ কীরকম পাগলের মতো তার দিকে ছুটে আসবে! প্রবীণের পিছন পিছন ওদের জ্যাঠা আর তার পিছনে লাঠি হাতে ঠাকুমা । আর সেই প্রবীণের বউদিদি — রামহারা সীতা, গৌর যাকে চোখে দেখেনি, শুধু কান্না শুনেছে ।

৩

গৌর অনেক দূর চলে এসেছে । সূর্যও দিগন্তে স্থির হয়ে বসে আকাশে মাঠে গাছপালায় দিনের শেষ রাঙা রোদ বুলিয়ে দিচ্ছে দেখে সে বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ল ।

মাঠের ও-মাথায় প্রথমে বাঁশঝাড়, তারপর ঘন বন । গৌর বাঁশঝাড়ের কাছে যেতেই তার মাথার ওপর চামচিকের দল এসে ওড়াওড়ি করতে লাগল । বনের মধ্যে যত দূর চোখ যায়, ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই । দূর থেকে একটা গোরুর ডাকও তো শোনা যাচ্ছে না! তাছাড়া, সন্ধে হতে চলল, সামনে গ্রাম থাকলে কোনো বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসত না! গৌর ভাবল, তবে কি লোকালয় ছাড়িয়ে এলাম? দেখাই যাক না ।

বনের মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে যখন সে ভাবতে শুরু করেছে এবার বোধহয় ফিরে যাওয়াই উচিত, ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল, একটু দূরে গাছপালায় ঘেরা একটা মাটির বাড়ি ।



গৌর বাড়ির পিছন দিকটা দেখতে পেয়েছিল, ঘুরে সামনে গিয়ে দেখল, দরমার তৈরি দরজা বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা । তার মানে বাড়ির লোকেরা এখনো ফেরেনি, ফিরবে নিশ্চয়ই!

গৌর দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে গাছে গাছে পাখিদের ঘরে ফেরা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি, হঠাৎ বন-কাঁপানো শেয়ালের তীক্ষ্ণ ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল । চারদিক অন্ধকার । ভালো করে নজর করে দেখল, দরজা তেমনি বাঁধাই রয়েছে । বাঁধন পরীক্ষা করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কে যেন তার কাঁধে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষিয়ে আচমকা গায়ের জোরে তাকে জাপটে ধরেই চেঁচিয়ে উঠল, দাদা, দাদা, দৌড়ে আয়! চোর ধরেছি । আজ একদম শেষ করে ছাড়ব!

— ধরে থাক, ধরে থাক — শক্ত করে ধর — বলতে বলতে বনের দিক থেকে কেউ একজন দৌড়ে এসে গৌরের চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় তার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল।

গৌর এতক্ষণে দেখতে পেল, যে ছেলেটা প্রথমে তাকে ধরেছিল সে তার থেকেও দু-এক বছরের ছোটই হবে কিন্তু তার দাদাটার বয়েস প্রায় দ্বিগুণ। ছোটটা এবার তাকে ছেড়ে দিয়ে বুকের কাছে গেঞ্জিটা খামচে ধরল। তারপর দুজনে মিলে সামনে-পেছনে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেলেটার দাদা চোখ-মুখের বিচ্ছিরি ভঙ্গি করে বলল, কাকের বাসায় ডিম পাড়তে এয়েছ! এবার তোকে বাঁচায় কে গো চাঁদ!

গৌরের চুলের গোড়া টাটাচ্ছে, তবু সে নির্বিকার স্পষ্ট গলায় বলল, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি পালাব না। প্রথমেই আমাকে চোর ভেবে নিলেন দেখে আশ্চর্য লাগছে। আপনাদের মনে বোধহয় সুখ নেই।

দাদার মুঠো আলগা হয়ে গেল, সে ঝপ করে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলল, ছেড়ে দে নিধে। চোর নয়, দেখছিস না ভয় পায়নি।

— চোরের চালাকি আমাকে শেখাতে আসিস না দাদা!

গৌর এই সুযোগে নিধের দিকে চেয়ে বলল, গেঞ্জি ছেড়ে দাও, আমি পালাব না। আমি তোমাদের বাড়িতে আজকের রাতটার মতো আশ্রয় নিতে এসেছি।

নিধে ঝাঁঝের সঙ্গে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, দাদা তাকে থামিয়ে গৌরকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের খপর তুমি পেলে কার কাছে? ঘরই বা খুঁজে পেলে কী করে?

— দিল্লি রোড ধরে যাচ্ছিলাম, সন্ধে হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি মাঠে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে এই বাড়িটা পেয়ে গেলাম। দরজা বাঁধা দেখে দাওয়ায় বসে বসে তোমাদের অপেক্ষা করছিলাম।

— আজ আমাদের ঘরে চাল নেই।

— আমার সঙ্গে দুমুঠো চিঁড়ে-মুড়ি আছে, রাতটা তিন জনের একরকম চলে যাবে মনে হয়।

নিধে তখনো এক হাতে গৌরের গেঞ্জি ধরে ছিল, তার দাদা এক ঝাপটায় হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, তখন থেকে বলছি ছেলেটা চোর নয়! ফের গায়ে হাত দিলে মারব এক থাবড়া! — তা হ্যাঁগো, তুমি এদিকে যাচ্ছিলে কোথায়? আসছোই বা কোত্থেকে?

— যাবার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। যখন যেদিকে ইচ্ছে বেরিয়ে পড়ি।

— মতলব?

— এক জায়গায় আটকে থাকতে ভালো লাগে? তেরো বছর বয়েস অব্দি কেটেছে বন্দিজীবন। এক গোরুর মায়ায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। আর ছিল একটা বটগাছ। তার যে কী মিঠে ছায়া কী বলব!

নিধের দাদা এবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সেটা ধরাতে ধরাতে হঠাৎ নিধের দিকে ফিরে বলল, নিধে! হাত সামলা বলছি! তখন থেকে দেখছি হুলোর মতো গর গর করছিস! তারপর ধোঁয়া ছেড়ে গৌরের দিকে তাকাল — পুলিশ কি তোমাকে জেলখানার গোয়ালে পুরে দিয়েছিল?

— না, না। আমি সাহাবাবুদের গোরু চরাতাম। আমার বাবাও সাহাবাবুদের বাড়িতে গোরু চরিয়েই স্বগ্যে গেছে।

— এই যে বললে তেরো বছর অব্দি বন্দিজীবন —

— এক-একটা লোক থাকে না, তাদের কাজই হল তোমাকে অপমান করা! তোমাকে খেতে দেবে, তাও অপমানের ভাত। লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা ছাড়া কথা নেই। সেই লোকের আশ্রয়ে থাকতে হলে সেটা বন্দিজীবন নয়?

বিড়িটায় লম্বা একটা টান দিয়ে নিধের দাদা সেটা টুসকি মেরে ঝোপের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে দরজার বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, চলো, চিঁড়ে-মুড়ি কতটা আছে দেখা যাক।

গৌর তার পিছন পিছন যেই না ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, নিধে অমনি চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, দাদা, আজ আমি একে মারব! মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দেব, ভুরু ফাটিয়ে দেব — আমাকে আজ বড্ড মেরেছে — আমি তার শোধ তুলে ছাড়ব!

বলতে বলতে দৌড়ে এসে সে গৌরকে ধরতে যাচ্ছিল, তার দাদা এক লাফে এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গৌরকে আগলে রেখে বলল, গায়ে মেখো না ভাই। নিধেটা আজ পাবলিকের হাতে বেদম মার খেয়ে পাগলা হয়ে আছে। তারকেশ্বর লাইনের মার জানো তো? ও আজ মরেই যেত। ভাগ্যিস আমি ধরা পড়িনি, পাবলিকের একজন সেজে খুব হম্বিতম্বি করে শেষপর্যন্ত ওকে সরিয়ে আনি। আমরা ভাই পকেটমার। আয় রে নিধে। মাথা গরম করিস না। ঘরে আয়, আমি সেঁক দিয়ে দেব।

ঘরে ঢুকে নিধের দাদা হ্যারিকেন জ্বালাল। সেই আলোয় নিধের মুখ দেখে গৌরের বুকখানা মোচড় দিয়ে উঠল। ইশ, এমনি করেও নাকি মারে! বাঁদিকের ভুরু কেটে রক্ত

ঝরে এখন শুকিয়ে গেছে । নীচের ঠোঁট ফাঁক । একটা চোখের নীচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে । দেখছে বোধহয় এক চোখে ।

নিধে ঘরে ঢুকেই ধপাস করে শুয়ে পড়ল । এতক্ষণে তার একদম অন্যরকম চিৎকার শুরু হল । যেন জবাইয়ের মুরগি । খানিকক্ষণ ওইরকম দাপাদাপি করে তারপর ফুলে-ফুলে সে কী কান্না! নিধের দাদা একটা ময়লা কাঁথা এনে নিধেকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিল । তারপর একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে হাঁড়ির তলাটা কাঁথার ওপর দিয়ে নিধের সারা গায়ে চেপে চেপে ঘষতে লাগল ।

নিধে তখনো কাঁদছে দেখে তার দাদা বলল, এত জোরে চ্যাঁচাচ্ছিস, সর্বনাশ একটা না ঘটিয়ে ছাড়বি না দেখছি!

গৌর তার কোঁচড় খুলে বড় একটুকরো পাটালি নিয়ে নিধের মাথা থেকে কাঁথা সরিয়ে তার মুখে দিয়ে নিধের দাদাকে বলল, ঠোঁট থেকে এখনো রক্ত পড়ছে । বাড়ির পাশেই ডোবার ধারে তখন ঢোলকলমির বন দেখলাম, দৌড়ে গিয়ে একমুঠো পাতা ছিঁড়ে আনুন তো । ঢোলকলমির রস লাগিয়ে দিলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে ।

জ্বলন্ত কাঠকয়লার হাঁড়িটা ভাইয়ের গায়ে চেপে ধরে দাদা বলল, দাঁড়াও, আগে গায়ের ব্যথাটা একটু মরুক । বড্ড মার খেয়েছে কিনা । মারও খেল, মালকড়িও পেল না — ব্যথার আর দোষ কী! চিঁড়ে-মুড়ির কথা বলছিলে না — তুমি বরং ততক্ষণে, ওই কোণে ওই যে দুটো থালা দেখছ, ওতে ঢেলে ফেল । রান্নাঘরে শালপাতা আছে, আমি শালপাতায় খাব । ভালো পাটালি অনেক দিন জিবে ঠেকাইনি ।

গৌর রান্নাঘরে গিয়ে কুঁজোর জল গড়িয়ে হাত ধুয়ে একটা থালায় গুড়-চিঁড়ে মাখল, আরেকটা থালায় মুড়ি ঢালল ।

নিধের দাদা ইতিমধ্যে ঢোলকলমির পাতা নিয়ে এসেছে, গৌর হাতের তালুতে ঘষে রস বের করে নিধের ক্ষতগুলোয় সাবধানে লাগিয়ে দিল ।

খেতে বসে তিনজনের কারো মুখেই কথা নেই, শুধু খচর-মচর শব্দ । নিধে হঠাৎ আপন মনে হেসে ফেলে গৌরকে বলল, তোমার তখন লাগেনি তো?

— দূর! আচ্ছা, একটা কথা বলো তো । তোমরা পকেট মারো কেন?

নিধের দাদা মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল, অন্যের পকেট ফাঁক না করলে নিজের পেটের ফাঁক তুমি বোজাবে কী করে শুনি?

হঠাৎ চিবনো বন্ধ করে সে সরু চোখে গৌরের মুখে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, এসব চিঁড়ে-মুড়ি ভিক্ষের জিনিস নয় তো? আমরা কিন্তু ভিক্ষের অন্ন মুখে তুলি না ।



— আমি চুরিও করি না, ভিক্ষেও করি না।

নিধেও মুড়ি চিবনো বন্ধ করেছিল, বলে উঠল, এখন আর গোরুও চরাও না। তাহলে এসব পেলে কী করে?

গৌর হেসে ফেলে বলল, সে অনেক কথা। পরে তোমাদের বলব। আচ্ছা, তোমরা গান জানো?

নিধে এবার মস্ত একমুঠো পাটালিমাখা চিঁড়ে মুখে পুরেছিল, ওই অবস্থায়ই দাদার দিকে চোখ ঠেরে হপহপ করে বলল, ওরে বাবা, আবার!

গৌর কিছু বুঝতে না পেরে হেসে ফেলে বলল, মানে?

নিধের দাদা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আমাদের কাছে গান-টানের কথা তুলো না। আমার বাবা ছিল নাম করা কবিয়াল। আমার ছোটবেলায় শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, সিঙ্গুর, হরিপাল থেকে লোকেরা এসে আসরে গাইবার জন্য বায়না করে যেত। বাবা গান বাঁধতও ভালো। তা, তাতে তখন একরকম চলেও যেত। তারপর সব কিছু বদলে যেতে লাগল। ওসব কবিগান-টান কে আর শোনে! আমরাও উপোস করে কাটাতে লাগলুম। দুমুঠো ভাতের অভাবে বাবা মরে গেল। মা মরে গেল। নিধের তখন তিন বছর বয়েস। ও যে কী করে বেঁচে রইল ও-ই জানে।

আপনিও নিশ্চয়ই ছোটবেলায় গাইতেন? আমার মনে একটা চিন্তা আসছে কিনা, তাই বলছি।

নিধের দাদা ঝেঁঝে উঠল — তখন থেকে আপনি-আপনি করে মরছ কেন? — গাইতাম বইকি!

গৌর খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, একটা গেয়ে শোনাও দাদা।

— বলছি না ওসব আমার মনে নেই! সে কি আজকের কথা নাকি! — তুমি তো বেশ ছেলে, এখনো নিজের নামটাই বললে না!

— আমার নাম গৌর। হ্যাঁ দাদা, ঘুমোবার আগে তোমরা শুয়ে শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ মনে করো?

নিধের দাদা পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতে বলল, শুয়ে চোখ বুজলেই দেখি পাবলিকের চড়-ঘুঁষিতে নাক-মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে, এর মধ্যে বাপ-মায়ের মুখ আবার ভাবব কখন রে!

দাদাকে বিড়ি বের করতে দেখে নিধে বলল, এবার একটা বিড়ি দে দাদা। আজ যা একখানা রাম ধোলাই হল, বাঁ কানটা ভোঁ-ভোঁ করছে!

সে বিড়ি নিয়ে দরজা ফাঁক করে বেরতে যাচ্ছে দেখে গৌর বলল, কোথায় যাচ্ছ? বসো না। কাজের কথা আছে।

— দাদার সামনে বসে বিড়ি টানব নাকি? বলে সে বাইরে চলে গেল।

নিধের দাদা নিজের বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলল, কাজের কথাটা কী?

— পকেট কাটার কাজটা তোমরা ছেড়ে দাও।

— আমরা তো আর তোর পকেট কাটতে যাচ্ছি না। আর কাজটা কিছু খারাপও না। আজ ধরা পড়ে গেছি, কাল ধরা না পড়ে কাজ হাসিল করতে পারলে পেট পুরে গরম গরম মাংস-ভাত খাওয়া ঠেকায় কে রে!

মাংসের কথায় হঠাৎই জিবে জল এসে গিয়েছিল, সড়াৎ করে টেনে নিয়ে আবার বলল, কাল থেকে তুইও বরং আমাদের সঙ্গে চ।

— যাব দাদা, তোমাদের সঙ্গেই যাব। পকেট কাটতে না, হাটে-বাজারে তোমাদের সঙ্গে গান গাইতে। গান গেয়ে হাট থেকে চাল-ডাল শাক-সবজি কিনে একসঙ্গে ঘরে ফিরব!

— গান গান করে একেবারে হেদিয়ে গেলি। বলছি না গানের কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়!

গৌর এরকম একটা কথা আশাই করেনি, অদ্ভুত একটা কষ্টে তার মুখ কালো হয়ে গেল।

নিধের দাদা হঠাৎ খুব রেগে উঠেছিল, সেটা খেয়াল হতেই কিছুটা নরম গলায় বলল, কাল তাহলে যাচ্ছিস তো? ভয়ের কিছু নেই রে। তোকে আমি দুদিনেই তৈরি করে দেব, দেখিস। কী রে, গৌর?

গৌর উত্তর দিল না।

নিধের দাদা একটা হাই তুলতে তুলতে বলল, গৌরকে কাল আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয় রে নিধে?

— খুব ভালো হয়! বেড়ে হয় দাদা! গৌর, যাবে তো?

গৌর একথারও কোনো উত্তর দিল না । সে কী একটা চিন্তায় ডুবে আছে ।

নিধের দাদা একটা মাদুর পাততে পাততে বলল, গৌরের বুঝি ঘুম পেয়েছে? হ্যাঁরে গৌর, তোর ছুরিটা আমাকে দিবি? ওটা তুই ছাতার মধ্যে রাখিস কেন রে?

গৌর ঘরের মাটিতে চোখ রেখে বসে ছিল । নিধের দাদার কথায় একবার শুধু চোখ তুলে চাইল, কিন্তু হ্যাঁ-না কিছুই বলল না । এমনকী নিধের দাদা যখন আধো ঘুমের মধ্যে জিজ্ঞেস করল, গৌর ঘুমিয়েছিস? — গৌর তখনো চুপ করে শুয়ে রইল, কথার জবাব দিল না ।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দুভাই দেখল, ঘরের দরজা খোলা, গৌর কোথাও নেই । শুধু তাদের মাথার কাছে থালাভরা চিঁড়ে-মুড়ি, খই-পাটালি । আর ঘরের কোনায় তার ছাতাটা, তারমধ্যে তার থালা, গেলাস আর একটা ছুরি ।



নিধের দাদা অবাক। ছাতার ভেতর থেকে জিনিসগুলো বের করে ছুরিটার ধার পরখ করতে করতে আপন মনে বলল, অদ্ভুত তো! ছুরিটা শুধু চেয়েছিলাম — এ যে দেখছি সবই রেখে গেছে!

নিধে বাড়ির চারপাশে জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা খোঁজাখুজি করে এসে বলল, একদম হাওয়া! হ্যাঁ রে দাদা, আমাদের কিছু ঝেড়ে দেয়নি তো?

— ঝেড়ে দেবার মতো আমাদের কী আছে রে? ওর নিজের জিনিসই তো ফেলে গেছে! এক কাজ কর, তুই বরং চিঁড়ে-টিরেগুলো মেখে ফেল। আমি ততক্ষণে ডোবা থেকে দুটো ডুব মেরে আসি। তোর ক্ষত এখনো শুকোয়নি, তোকে আজ আর নাইতে হবে না।

খেতে বসে নিধে হঠাৎ কেঁদে ফেলল — দুবেলা চিঁড়ে-মুড়ি চিবোতে কারো ভালো লাগে! দাদা, আমি ভাত খাব। একমুঠো চাল তুই ফুটিয়ে দে। আমি শুধু নুন-লংকা দিয়ে খেয়ে নেব।

— ঘরে চাল আছে নাকি! সাত হাত মাটি খুঁড়লেও একদানা বেরবে না। চটপট খেয়ে নে, তারপর চ আজ একটু সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়ি। তেমন মক্কেল জুটে গেলে ওবেলা তোকে মাংস-ভাত খাওয়াব—মা কালীর দিব্যি!



দুভাই চুল আঁচড়ে, যতটা পারল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রোজকার মতো দরজা বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। বন পেরিয়ে, বাঁশঝাড় পেরিয়ে, মাঠ ভেঙে বড় রাস্তায় পড়ে তারা রেলের ইস্টিশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

নিধের দাদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, নিধে! গৌর না? ভালো করে দেখ তো—এ নিশ্চয়ই গৌর!

গৌরও দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়েছে। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে কাছে এসে বলল, এ কী! তোমরা যে আজ বেরিয়েছ?

—না বেরলে চলে? তা তুই যে অমন কাউকে কিছু না বলে চোরের মতো পালালি!

—পালাব কেন! আমার সংকেত তোমরা বুঝতে পারোনি?

দুভাই একসঙ্গে বলে উঠল, সংকেত?

গৌর অবাক হয়ে বলল, আশ্চর্য তো! দুটো থালায় চিঁড়ে-মুড়ি, খই-পাটালি দেখতে পাওনি? তার মানে এবেলা আর তোমাদের ভাতের চেষ্টা করার দরকার নেই। আর ছাতাটা যেমন ছিল তেমনি রেখে এসেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো আমি ফিরে আসব।

নিধের দাদা বলল, তা সেকথা বলে এলেই তো পারতিস!

—আমি কি চলে যাচ্ছি নাকি যে বলে যাব? তাছাড়া তোমরা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলে। —পা চালিয়ে চলো। এতে কী আছে বলো দেখি?

বলে সে হাতের পুটলিটা উঁচু করে ধরল।

দুভাইয়ের কৌতূহলী চোখের দিকে চেয়ে গৌর হেসে বলল, চাল, লাউ, বড় বড় সরপুঁটি। তেল-নুন-লংকাও এনেছি। তোমাকে আজ রাঁধতে হবে দাদা। আমাকে বিকেলে ফের বাজারে যেতে হবে। ছাড়তেই চায় না। ঘরে দুভাই পথ চেয়ে আছে বলে চলে এসেছি।

নিধের দাদা বলল, কোথায় কী করে এলি রে?

—কী আবার করব? গান গাইলাম। তবে তোমাদের আর গাইতে বলব না। একলাই গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে তোমাদের দেব।

গৌরের আজ চান করা হয়নি, সে বাড়ি পৌঁছে জিনিসপত্র, টাকাপয়সা নামিয়ে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

খুচরো আর নোট মিলিয়ে হিসেব করে নিধের দাদার চক্ষুস্থির! সে রান্নাঘরে কাঠের আগুনে ভাত চড়িয়ে এসে ভাইকে বলল, কথাটা কাল গৌর মন্দ বলেনি নিধে! তিনজনে মিলে গান গেয়ে যদি চলে যায় তাহলে আর ওই ঝক্কি-ঝামেলায় যাই কেন? তুই কী বলিস?

— ও তো বলল, ও একাই রোজগার করে সব আমাদের দিয়ে দেবে।

— সে কি একটা কথা হল?

এই সময় গৌর ঘরে ঢুকতে নিধের দাদা বলল, তুই যে গাইতে পারিস সেকথা কাল একবারও বলিসনি তো?

— তোমরা আর বলতে দিলে কোথায়?

— তুই-ই তো মুখ গোঁজ করে বসে রইলি!

— তখন একটা গান বাঁধছিলাম যে!

— একটা গা তো শুনি। আজ যেগুলো গেয়েছিস তার একটা শোনা।

গৌরকে আর কিছু বলতে হল না। সে তক্ষুনি সুর করে হাত-পা নেড়ে গাইতে শুরু করল —

চুরি করি, পকেট মারি আর করি ছিনতাই
বুকের কাছে ছুরির ফলা — যা আছে দিন তাই!
খুন-খারাবি রাহাজানি
পাপ-পুণ্যের ভেদ না মানি
দস্যুগিরি পেশা আমার — দিন আনি দিন খাই।
একদিন এল এক মুনি
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি তক্ষুনি
মুনি বলে, মেরো বাবা পরে
যাও দেখি একবার ঘরে
এ পাপের বোঝা নেবে কে?
আগে জান, পরে প্রাণ নে।
জানার যা তা সব জেনেছি ভাই
পাপের কোনো অংশীদার নাই
তাই দুবেলা এই রামায়ণ গাই
ভালোবেসে অন্ন দিলে দুমুঠো ভাত খাই।

শুনতে শুনতে দুভাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল । গৌর থামতেই নিধের দাদা বলল, আমাদের পকেট মারার কথাটাও লাগিয়েছিস দেখছি ।

গৌর হেসে বলল, এ হল দস্যু রত্নাকরের গান । কাল নতুন করে বেঁধেছি । রাম-হারা সীতার গান শুনবে? নবীনদার বাড়িতে দেখে এলাম কিনা ।

গৌর বোধহয় রাম-হারা সীতার গান ধরতে যাচ্ছিল, নিধে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, দাদা! ভাত পুড়ে যাচ্ছে!



খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে এল। গৌর বেরবার তাল করছে দেখে নিধের দাদা বলল, তোর সঙ্গে আমরাও যাব। তার আগে, আয়, ক'টা গানের মহড়া দিয়ে নিই।

গৌর একটু গম্ভীর গলায় বলল, ওসব থাক না দাদা। গানের কথায় তোমার তো পিত্তি জ্বলে যায়!

— রাগের মাথায় কখন কী বলেছি সেটাই ধরে থাকবি? নে, ধর —

খানিকক্ষণ গানের মহড়া দিয়ে তিন জনে বেরিয়ে পড়ল। বাজারে পৌঁছতেই কয়েকজন গৌরকে দেখে বলে উঠল, এসো, এসো, দাদা।

আলু-পেঁয়াজের দোকানি বলল, কথাটা তাহলে রাখলে! ধরো বাবা একখানা —

বাজারের সামনে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে তিন জনে গলা মিলিয়ে গান ধরল। দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল। একেকটা গান শেষ হয় আর লোকেরা কাছে এসে গৌরদের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে যায়। কেউ কেউ আবার 'ভারি মিঠে গলা', 'বড় দরদ দিয়ে গাইছে হে' বলে একটাকা-দুটাকার নোটও দিয়ে যাচ্ছে। মজার কথা, নিধে চোখ পিট পিট করে দেখল, একটা কনস্টেবলও মাথা নেড়ে নেড়ে মশগুল হয়ে তাদের গান শুনছে।

সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। গান শেষ করে গৌর দেখল, ফুলের দোকানি ঝাঁপ বন্ধ করার তোড়জোড় করছে। গৌর লোকটাকে দেখিয়ে নিধের দাদাকে বলল, সিঙ্গুরের জলাঘাটা গ্রামে এনার বাড়ি। এনার দোকানে যত ফুল দেখছ, সব নিজের বাগানের। বাগানখানা নাকি দেখবার মতো! এনার বাড়িতে আজ আমি থাকব। সকালেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে। সেখান থেকে এবার একটু দূরে কোথাও যাব ভাবছি। শোনো দাদা, আয় রে নিধে, গান গেয়ে কেমন লাগল বল? পকেটমারার চেয়ে খারাপ? উঃ, আজ যে আমার কী আনন্দের দিন! রোজ গাইতে হবে, মনে থাকে যেন। বলে সে তার কোঁচড়ের টাকাপয়সা সব নিধের হাতে দিল।

গৌর আরো কী বলতে যাচ্ছিল, দেখল নিধের দাদার চোখ জলে ভরে গেছে। সে তার আরো কাছে গিয়ে বলল, কাঁদছ কেন দাদা? আবার কখনো আসব।

নিধের দাদা ধরা গলায় বলল, তুই তাহলে জানতিস তুই এখান থেকেই চলে যাবি!

গৌর হেসে বলল, এ-ও জানতাম তোমরা আজ আমার সঙ্গে বাজারে গান গাইবে।

এইসময় ফুলের দোকানি গৌরের কাছে এসে বলল, তাহলে চলো বাবা, রওনা হওয়া যাক। ছটা বাইশের ট্রেন ধরলে সাতটায় বাড়ি পৌঁছব।

গৌর চলে যাচ্ছে, নিধে এতক্ষণে বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল — ইয়ার্কি নাকি! তুমি যে বললে আমাদের বাড়ি যাবে — রোজ আমাদের সঙ্গে গান গাইবে!

গৌর হেসে ফেলে বলল, তুই কি খোঁড়া? আমি কি তোর লাঠি? পৃথিবীটা দেখব বলে বেরিয়েছি, আমার কি একজায়গায় আটকে থাকলে চলে?



৪

— মিঠে গলার গান আর প্রস্ফুটিত ফুল — এ হল গিয়ে একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ । কোনো তফাৎ তুমি খুঁজে পাবে না । সাবধানে এসো বাবা । বাঁয়ে পুকুর । দেখে পা ফেল । আরে খেলে যা— জোনাকির জ্বালায় পথ চলা দায়! সাবধানে বাবা, মাথা বাঁচিয়ে । এ ঝোপঝাড় তুমি কেটেও সাফ করতে পারবে না । রোজ রোজ কাটছেই বা কে! বর্ষায় রাস্তাভরা ব্যাঙাচি আর সন্ধে হলেই গাছভরা জোনাকি — এই হল গিয়ে আমাদের জলাঘাটা ।

ফুলের দোকানিকে মুখের সামনে থেকে মশা তাড়ানোর মতো জোনাকির ঝাঁক তাড়াতে দেখে গৌরের মজাই লাগছিল । ইস্টিশনে নেমে সিঙ্গুরের হাটবাজার ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে পড়া-ইস্তক লোকটা কখনো আপন মনে, কখনো গৌরকে সম্বোধন করে নানা কথা বলে যাচ্ছে । এরই মধ্যে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, ছোটবেলায় কী ভাবতাম জান? ভাবতাম শাঁখারিপাড়ায় যেমন শাঁখা তৈরি হয়, তেমনি জোনাকি তৈরিরও আলাদা একটা পাড়া আছে । কারিগররা সেখানে সারা দুপুর ধরে জোনাকি বানিয়ে সন্ধেবেলা ঝোপেঝাড়ে ছেড়ে দিয়ে যায় । এমন নাছোড়বান্দা জোনাকি কোথাও দেখেছ? তোমার নামটা তো জানা হল না, বাবা ।



গৌর বলল, আমার নাম গৌর । জোনাকি আমি অনেক দেখেছি । বাবুইয়ের বাসায় কাদায় মাথা-গোঁজা জোনাকিও দেখেছি । তবে আমি জানতাম, জোনাকিরা মানুষের সাড়া পেলেই এঁকেবেঁকে নাচতে নাচতে সরে যায় । এখানকার এরা একটু একগুঁয়ে ।

শুধু জোনাকিই নয়, গৌর আরো একটা জিনিস দেখে অবাক হল । রাস্তার ধারে বড় বড় নিম, গাব, বেল গাছের ভিড়ে বহুদিনের পুরনো মস্তবড়ো এক-একটা বাড়ি । বাড়ি তো

নয়, বাড়ির কঙ্কাল। জানলা-দরজার চিহ্ন নেই, সে-জায়গায় খালি একটা অন্ধকার গর্ত। মড়কের সময় হাড্ডিসার গোরুর পাঁজরার মতন দেয়ালের ইট বেরিয়ে পড়েছে। দেয়াল ফুঁড়ে দলে-দলে বট অশ্বত্থগাছ দিব্যি জাঁকিয়ে উঠেছে। জলাঘাটা জায়গাটা তাহলে অনেক কালের পুরনো। তাছাড়া এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে এত বড় বড় বাড়ি! এইসব বাড়িতে থাকতই বা কারা?

হঠাৎ খুব কাছ থেকে টানা হাম্বা রব শুনে ফুলের দোকানি বলল, এসে গেছি বাবা। ওই যে হাম্বা শুনলে, ও আমারই গোয়ালের গোরু। কাল সকালে তোমাকে ওর টাটকা দুধ খাওয়াব। বটের আঠার মতো ঘন।

বাঁদিকে চালাঘরে গোরুর গোয়াল। ডানদিকে পাঁচিল ঘেরা মস্ত বাড়ি। এও সেই রাস্তার ধারের পোড়োবাড়ির মতো, পাঁচিলের পাঁজরা দেখা যায়।

পাঁচিলের এক জায়গায় মস্ত ভারী, মজবুত দরজা। গৌর দেখল, লোকটা পকেট থেকে চাবি বের করে ঝুঁকে পড়ে তালা খুলছে। এতবড় একটা বাড়িতে লোকটা একা থাকে নাকি?

ফুলের দোকানি বোধহয় গৌরের মনের ভাব টের পেয়েই দরজার ভারী পাল্লা-দুটো গায়ের জোরে ঠেলতে ঠেলতে বলল, আমার ছেলেটা বড্ড দামাল! আমি না থাকলে কোথায় কখন বেরিয়ে যায় ঠিক নেই। সেই ভয়েই রোজ সদর দরজায় তালা দিয়ে বেরতে হয়, বাবা। এসো, ভেতরে এসো।

— কে? বাবা এলেন? সঙ্গে ওটা কে? নকুল নাকি? হ্যাঁগো নকুল, তুমি যে বড়ো ফিরে এলে? ফিরতেই হবে, আমি আজ সারাদিন যুধিষ্ঠিরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করেছি কিনা। আমার দরজাটা খুলে দাও তো ভাই, এবার তোমার সঙ্গে যাব — আর আমায় ঠেকাচ্ছে কে! এই যে, এদিকে। এই জানলাটার ডানদিকে দরজা। শেকলটা খুলে দাও!

গৌর তো অবাক। কে এরকম করে কথা বলছে? কথাগুলো আসছে ডানদিকের ঘর থেকে। ডান দিকে ওই একটাই ঘর। দরজা বন্ধ। পাশের জানলায় কে একজন দাঁড়িয়ে আছে, ঝাপসা মতন দেখা যায়।

উঠোনের ও-মাথায় তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে আসল ঘর-দালান। গৌর সবে উঠোন পেরিয়ে ফুলের দোকানির পিছন পিছন সেদিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ এরকম অদ্ভুত কথা শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে ফুলের দোকানি পিছিয়ে এসে গৌরকে চাপা স্বরে বলল, কথার জবাব দিয়ো না, বাবা। চলো, ঘরে চলো। কাল তোমাকে সব বলব।

— আপনাকে বাবা বললেন, এই কি আপনার সেই ছেলে?

— তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। হ্যাঁ বাবা, এই আমার একমাত্র ছেলে। এমন ছেলে লাখে একটা হয় না। একেবারে হীরের টুকরো। চাকরিও করত ভালো।

হঠাৎ কী হল, একদিন আপিস থেকে বাড়ি না ফিরে সোজা চলে গেল মানালি। সেখানে বিপাশা নদীর ধারে একটা সরকারি হোটেল আছে। সেখান থেকে চিঠি লিখল, ও আর এই পৃথিবীতে থাকতে চায় না, যুধিষ্ঠিরদের মতো মহাপ্রস্থানের পথে যেতে চায়। কী আর বলব, শেষপর্যন্ত ওকে হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে জলাঘাটায় ফিরিয়ে আনি। খুব ছোটবেলায়ও ওর একবার মহাপ্রস্থানের পথে যাবার রোখ চেপেছিল। মা মারা যাবার পর ছেলেটা কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। একবার গরমের ছুটিতে মামাদের সঙ্গে মানালি বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে নাকি জগৎসুখ বলে একটা গ্রাম আছে। মহাভারতের যুধিষ্ঠিররা নাকি সেপথ ধরেই স্বর্গে গিয়েছিলেন। সেই বছরই বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক আগে ও বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। সেবার আউটরাম ঘাট থেকে পুলিশ লাগিয়ে ওকে ধরে আনতে হয়। তারপর তো ইস্কুল-কলেজে ভালো ভালো পাশ দিয়ে বাটা কোম্পানিতে চাকরি পেল।

ততক্ষণে ডানদিকের ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে ভিতর থেকে চিৎকার — খুলে দিন, আমার দরজা খুলে দিন। আমি আর এখানে থাকব না। নকুল, নকুল! শেকলটা খুলে দাও! বাবা, খুলুন বলছি!

কথার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কার আওয়াজও বাড়ছে। ফুলের দোকানি গৌরের হাত জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে বলল, গান ধরো বাবা। যা হোক একটা গান ধরো। গান শুনলেই ও শান্ত হয়ে যাবে।

গৌর প্রথমটায় কিছুটা ভ্যাবাচ্যাবা খেয়ে গিয়েছিল, অনুনয় শুনে তার মন সজাগ হয়ে উঠল। বলল, ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন।

ফুলের দোকানি এবার হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠল। পরের মুহূর্তেই কান্না সামলাবার চেষ্টা করে বলল, বদ্ধ পাগল, ছেলেটা আমার বদ্ধ পাগল! শুধু গানেই যা একটু শান্ত থাকে। তোমাকেও সেজন্যই ধরে এনেছি বাবা। একটা গান তো আর না ধরলেই নয়!

এত বড় একটা মানুষকে হঠাৎ কেঁদে ফেলতে দেখে গৌর অবাক হয়ে ভাবল, এই এক অদ্ভুত রহস্য! মানুষ যে কখন কাঁদবে, কখন হাসবে, আগে থেকে সে নিজেও জানতে পারে না!

ডান দিকের ঘরে তখনও তাণ্ডব চলছে। গৌর চটজলদি মনে মনে একটা গান বেঁধে নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়েই এক হাতে কান চেপে এক হাত সামনে বাড়িয়ে গান ধরল —

এই পৃথিবীর রাজা তিনি স্বর্গে চলেছেন —
তিনি স্বর্গে চলেছেন ।
কে বটে তিনি কে?
স্বয়ং ধর্মপুত্তুর হে ।

রাজ্যপাট জয় করেও রাজ্য ছেড়েছেন,
জলাঘাটার একটি লোকের ঘুমটি কেড়েছেন —
তিনি স্বর্গে চলেছেন ।
চার ভাই আর দ্রৌপদীও সঙ্গে চলেছেন —
তাঁরা স্বর্গে চলেছেন ।

চার ভাই আর দ্রৌপদী ওই মাটি নিলেন গো —
কাঁথা গায়ে দিয়ে দাদা এবার তুমি শোও ।
কাল সকালে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যাবেন কে?
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব কালকে সকালে ।

দাদা গো দাদা, অন্ন খেয়ে ঘুমোন,
দাদা গো দাদা, শান্ত করুন মন ।

ফুলের দোকানি ঠিকই বলেছে, গানের দুয়েকটি পদ গাইতেই দরজা ধাক্কানো বন্ধ হয়ে গেল । ঘরে লোক আছে বলে মনেই হয় না । গৌর একবারও না থেমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গানটা গাইতে লাগল । পাগল ছেলেকে শান্ত হতে দেখে ফুলের দোকানি এবার একহাতে হ্যারিকেন আর-এক হাতে ছোট একটা হাতজাল নিয়ে গৌরের কাছে এসে বলল, গাইতে থাক বাবা । আমি যাব আর আসব । দেখি, যদি বড় মাগুর একটা জালে তুলতে পারি ।

সে-রাতে পাগল লোকটার আর সাড়াই পাওয়া গেল না। ফুলের দোকানি গৌরকে নিজের হাতে সকালের রান্না কয়েকটা পদ আর গরম গরম মাগুর মাছের ঝোল-ভাত বেড়ে দিয়ে নিজেও খেতে বসে গেল। গৌর বলল, ওনাকে দিলেন না?

— খাওয়ার চেয়ে ঘুমটাই ওর বেশি দরকার। লম্বা একটা ঘুম দিতে পারলে পরদিন ছেলেটা শান্ত থাকে। তখন ও যে পাগল, তুমি বুঝতে পারবে না। ভালো থাকলে ও তোমার-আমার মতোই। নিজে থেকে পুকুরে গিয়ে চান করবে। আমার সঙ্গে বসে ভাত খাবে। তারপর আমি বেরিয়ে গেলে ও চুপ করে ফুলের বাগানে গিয়ে বসে থাকবে। খেপে গেল তো অস্থির কাণ্ড। তখন ওকে ঘরে ঢুকিয়ে শেকল তুলে দিয়েও নিশ্চিন্তি নেই, সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বেরতে হয়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গৌর দেখল, এর মধ্যেই পাগল লোকটার বাবা বাগানের কাজকর্ম সেরে এসেছে। তার হাতে পায়ে ঘাস-পাতার কুচি লেগে আছে।

দুজনে পুকুরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে উঠোনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। শেকল খুলে ঘরে ঢুকে লোকটা গৌরকে ডাকল, এসো বাবা, ভেতরে এসো। দ্যাখ বিধান, কে এসেছে। এর নাম গৌর। কী চমৎকার যে গায়! চ, আমাদের সঙ্গে চান করে এসে দুটি খেয়ে নিবি। তারপর গৌর তোকে সারা দুপুর বাগানে বসে গান শোনাবে। বাবা গৌর, একে তুমি বিধানদাদা বলে ডেকো।

গৌর বিধানদাদার চেহারা দেখে অবাক। মুখখানা আশ্চর্য সুন্দর! গাল-চিবুক লতিয়ে দাড়ি নেমেছে। গায়ের রং ইট-চাপা ঘাসের মতো। একটু রোগা, কিন্তু চমৎকার লম্বা চেহারা। এখানে-ওখানে ধুলো-ময়লার দাগ, কপালে ও ডান বাহুতে কালশিটেও পড়েছে।

বিধানও গৌরকে এতক্ষণ দেখছিল, চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা লাজুক হাসি ফুটিয়ে বলল, একটা গান গাইবে?

তার বাবা বললেন, এখন না বিধান, তোর বড্ড খিদে পেয়েছে বাবা। আগে চান করে দুটি মুখে দে, তারপর সারাদিন গান শুনিস। কতদিন পর তোর অমন হাসি দেখলাম — বুকখানা আমার জুড়িয়ে গেল!

গৌর বলল, সেই ভালো, চান-খাওয়া সেরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গান গাইব। চলুন তো দেখি আমাকে সাঁতারে হারাতে পারেন কিনা। বার-কতক এপার-ওপার করলে যা একখানা খিদে পায় না! মনে হয় এক হাঁড়ি ভাতও কিছু না! বুকসাঁতার দেবেন, না চিৎসাঁতার?

— আমি ডুবসাঁতারও পারি ।

গোয়াল বাঁয়ে রেখে অল্প একটু এগোলেই ডান দিকে বাগানের মধ্যে পুকুর । মস্ত বড়ো বাগান ।

ফুলে-ফুলে চোখ সত্যিই জুড়িয়ে যায় । একধারে অনেকগুলো ফলের গাছও রয়েছে । আম-জাম কাঁঠাল সবেদা গাছ দূর থেকে দেখেই চেনা যায় । বাগানের তিন দিকে নারকোল গাছের সারি । ফুলবাগান আর ফলের গাছ ছাড়িয়ে এক ধারে কলাগাছ । পুরো বাগান ঘিরে ঘন রাংচিতার বেড়া । মাঝে মাঝে মাদার গাছও আছে ।



পুকুরের অর্ধেকটা জুড়ে সকালবেলার রোদ, বাকি অর্ধেক বড় বড় গাছগুলোর ছায়ায় ঢাকা। রোদের দিকে ঘাট বেয়ে গৌর ওদের সঙ্গে জলে নামতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শালিখের চোখের মতো চকচকে জলের নীচে সিঁড়িতে এক ঝাঁক পুঁটি তির-তির করে ছোট্ট ছোট্ট পাখনা আর লেজ নাড়ছে।

বিধানের বাবা জলের ঠিক ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পুঁটির ঝাঁক তাড়িয়ে পুকুরে নামতে নামতে বললেন, এখানে এঁটো থালা ধুই তো, তখন দুচারটে ভাত পড়ে। পুঁটিমাছেরা ভাবে যখনই আসি, এঁটো বাসন ধুতেই বুঝি আসি।

গৌর কিছুটা পুকুর-পাগল। বেশ কয়েকবার বুক সাঁতারে চিৎসাঁতারে বিধানদাদার সঙ্গে এপার-ওপার করে সে মনের সুখে চান করল। কাল নিধেদের ছোট ডোবায় চান করে তার সুখ হয়নি।

বাড়ি ফিরে বিধানের বাবা এক জোড়া কাচা ধুতি আর ফতুয়া বের করে দুজনকে দিয়ে বললেন, খেয়ে উঠে তো ফুলবাগানে বসবে। তোমাদের জামাকাপড়টাও ফুলের মতো রঙিন না হোক, অন্তত পরিষ্কার হওয়া চাই।

রান্নাঘরের মেঝেয় পিঁড়ি পেতে বসে বাপ-ছেলের সঙ্গে ভাত খেতে খেতে গৌর লক্ষ করল, বিধান মাঝে মাঝেই আড়চোখে তাকে দেখছে। গৌর একসময় মাছ-ভাত শেষ করে দুধ-কলার বাটি টেনে নিতেই বিধান বলে উঠল, তুমি যে বললে এক হাঁড়ি ভাতও কিছু না! এ তো তিনজনে মিলে খেলাম।

গৌর হেসে ফেলল — একাই সব খেয়ে নিলে আপনারা কী খেতেন? ভাত তো ভাগ করেই না খেতে হয়?

বিধানের বাবা খেতে খেতে মুখ তুলে গৌরকে বললেন, বলেছিলাম না বটের আঠার মতো! ও মর্তমানও বাগানের। খাও বাবা, পেট ভরে খাও। ঘরে পাকা পেঁপে আছে, নারকোল আছে — যখন ইচ্ছে তোমরা খেও।

ধুতির ওপর শার্ট চড়িয়ে, শার্টের হাতা গুটিয়ে বিধানের বাবা যখন দুগ্গা দুগ্গা বলে বেরতে যাচ্ছেন তখন তাঁর মুখ দেখে মনে হল আজ ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বেরচ্ছেন।

সদর দরজা পর্যন্ত এসে গৌর বলল, বাজারে আমার সঙ্গে সেই যে দুজন গান গেয়েছিল — নিধে আর নিধের দাদা, তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, গৌর তাদের ভোলেনি।

— বলব বইকি, বলব । বলতে বলতেই তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে ডাকলেন, বিধান? বিধান কোথায় গেলি রে?

বিধানের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না ।

— ছেলেটা গেল কোথায়?

গৌর জানে, বিধানদাদা উঠোনেই বাঁদিকের কাঁঠাল গাছটার গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়েছে । সে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়ুন । বিধানদাদার ভার আমি নিলাম ।

— কী করে এত জোর দিয়ে বলছ বাবা?

— তাহলেই বুঝুন, চিন্তার কিছু নেই ।

— দেখো বাবা । দুগ্গা, দুগ্গা ।

দরজাটা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই বিধান কাঁঠালগাছ ছেড়ে বেরিয়ে এল । গৌর কাছে গিয়ে বলল, আপনি হঠাৎ লুকোতে গেলেন কেন?

— বাবা যদি আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে শেকল তুলে দিতেন? তোমার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে কিনা ।

গৌর লক্ষ করল, বাবা চলে যেতেই বিধানদাদার লজ্জার ভাবটা অনেক কেটে গেছে । সে হেসে ফেলে বলল, বাবা শেকল দিয়ে গেলে আমি খুলে দিতে পারতাম না?

— তুমি যদি না খুলতে? তুমি জগৎসুখ কোথায়, জানো?

বলা নেই, কওয়া নেই, বিধানের চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা ফুটে উঠল । সে দু হাতের আঙুল জোরে জোরে মোচড়াতে মোচড়াতে বলল, জানো, একটা সাধু সব জানত । জগৎসুখ গ্রাম হয়ে যুধিষ্ঠিররা যে পথে স্বর্গে গিয়েছিল সে আমাকে সেই পথের হদিশ দেবে বলেছিল । মামা পুলিশ দিয়ে আমাকে ধরে না নিয়ে এলে আমি ঠিক স্বর্গে পৌঁছে যেতুম ।

বেঁচে থেকে সশরীরে স্বর্গে যাবার কথা কেউ সত্যিই ভাবছে গৌর নিজে না শুনলে বিশ্বাস করত না । যুধিষ্ঠিররা হলেন গিয়ে সেই সত্যযুগের মানুষ, তাছাড়া তাঁরা ঠিক আমাদের মতো সাধারণ মানুষও ছিলেন না । দশরথ দশহাজার বছর বয়স অব্দি বেঁচে ছিলেন, পুত্রশোক না পেলে আরো কোন না দু-পাঁচশ বছর বেঁচে থাকতেন! তা বলে এখন কি কেউ দু-তিনশো বছরও বাঁচতে পারে?

বিধানের চোখ-মুখের ভাব দেখে গৌর বিমূঢ় বোধ করে । এত বড় বয়সের একটা লোকের বদ্ধমূল ধারণা, সে এই পৃথিবীর রাস্তা ধরে এগোলেই স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারবে, সেরকম রাস্তা জগৎসুখ না কী, সেদিকে কোথাও আছেই — এ যে ঘোর উন্মাদ! দিব্যি পুকুর সাঁতরে চান করল, এক হাঁড়ি ভাতের কথাটাও কেমন মনে রেখেছে, পরিষ্কার ধুতি-ফতুয়ায় দেখাচ্ছেও ভারি সুন্দর, অথচ ওই একটা ব্যাপার গোরুর গায়ে এঁটুলির মতন মনের মধ্যে সেঁটে আছে!

বিধান চোখের তারা কীরকম এদিক-ওদিক করতে করতে বলল, জগৎসুখ অব্দি তো আমি নিজেই গেছি । সেখান থেকে বড়জোর দু-তিন মাসের রাস্তা — বুঝলে না?



আবার খেপে যাবে না তো? একটা গান ধরবে না কি? গৌর জোর করে হেসে ফেলে বলল, চলুন, বাগানে যাই । বাগানে আপনাকে গান শোনাব । আপনার মহাপ্রস্থানে যাবার ব্যাপারটাও শুনব ।

বিধান একথায় খুব খুশি হয়ে বলল, ভাগ্যিস, তুমি এসেছ! ডাব খাবে?

— চলুন, আগে বাগানে যাই ।

— ডাব তো বাগানেই । আমার খুব ভালো লাগছে, তাই তোমাকে ডাব খাওয়াতে চাই । এসো —

সদর দরজার খিল খুলে বাগানের দিকে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে বিধান আবার শুরু করল — বাগানের বেড়ার ওপাশে কুঁড়েঘরগুলো দেখলে না — ওখানেই আমাদের মালিরা থাকে । ভোরে বাবার সঙ্গে বাগানের কাজ সেরে সারাদিন ঘুমোয় । ওদের বললেই তোমাকে ডাব পেড়ে দেবে ।

বাগানে পৌঁছে গৌর বলল, এখন আর ডাব খাব না । আসুন, এখানে বসি । যুধিষ্ঠিরদের স্বর্গে যাবার পথের হদিশ কত দূর পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেনই বা কী করে, সব খুলে বলুন তো ।

লোকে যেমন গান গাইবার আগে, বা যাত্রায় পার্ট বলবার জন্য আসরে ঢোকবার মুখে গলা পরিষ্কার করে নেয়, বিধানও সেইরকম বার কতক গলা খাঁকড়ে নিয়ে শুরু করল —

কোনো সাধু যদি তোমার দিকে হঠাৎ হাতের ত্রিশূল বাগিয়ে বলে ওঠে, 'ওরে শয়তানের ডিম! তখন থেকে আমার ছাউনির চারপাশে ঘুর-ঘুর করছিস — দেব নাকি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে!' তখন তোমার মনের অবস্থাটা কেমন হয়? আমার তো শুনেই ঠোঁট-জিব শুকিয়ে কাঠ । দৌড়ে পালাব তার উপায় নেই, পা যেন মাটির সঙ্গে সাঁটা । কোনরকমে বলবার চেষ্টা করলুম, 'আজ্ঞে, ঘুর-ঘুর করিনি, যুধিষ্ঠিরদের মহাপ্রস্থানের পথ কোন দিকে আপনাদের কাছে জানতে এসেছিলাম ।' কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরল না ।

সাধুটার ডান হাতে ত্রিশূল । এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে আমার একটা হাত ধরে এক হ্যাঁচকায় আমাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বলল,

বল তো ব্যাটা, মতলবটা কী?

খেতে এয়েছ গরম ভাতে ঘি?

মারব একটি চড়!

আমার নাম জর্নাদন ভড় ।

জটাজুটধারী ভস্মমাখা সন্ন্যাসী কখনো বাংলায় কথা বলে? আমি প্রথমটা ত্রিশূল দেখে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে ভাষাটা খেয়াল করিনি, পদ্য শুনেই মনে হল, তাই তো, কী ব্যাপার? তার ওপর আবার সাধু হবার আগেকার নাম বলছে? লোকে সাধু হয়েই নাম বদলে ফেলে জানো তো? তখন আর আগেকার নাম মুখে আনতে নেই ।

ছড়া শুনেই হোক, বা লোকটার ভাব-ভঙ্গি দেখেই হোক, আমার বুকের ধড়াস-ধড়াসটা যেন একটু কমেছে মনে হল । যদিও মাটিতে পড়ে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, তবু একটু সাহস করে বললুম, ‘আমার কোনো খারাপ মতলব নেই সাধুজি । বাড়িতে আমার মন টেকে না, তাই স্বর্গে যাবার রাস্তা খুঁজছি — যুধিষ্ঠির যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল, সেইটা ।

সাধু বোধহয় আমার কথাটা বিশ্বাস করল না । চোখ ঘুরিয়ে বলল,

মিথ্যে বললে, খবরদার!

এক কৌটো জরদা আর

মিঠে পাতা মশলা পান

দৌড়ে গিয়ে কিনে আন ।

কাঁদিস না আর, দুচোখ মোছ —

পাউরুটি আর ডিমের পোচ —

ডবল ডিমের — আনিস ভাই ।

একবারই তো দিনে খাই ।

গৌর শুনতে শুনতে মজাই পাচ্ছিল, এইখানটায় বিধানদাদাকে একবার থামিয়ে দিয়ে বলল, সাধুর সঙ্গে আপনার দেখা হল কী করে?

— গঙ্গাসাগর মেলায় যাবার তোড়জোড় শুরু হতেই আমি প্রায় রোজই স্কুল কামাই করে আউটরাম ঘাটে গিয়ে সাধুর খোঁজ করতুম কিনা । প্রতি বছর ওই সময়টা গঙ্গাসাগর যাবার পথে ভারতের দূর দূর প্রান্ত থেকে, হিমালয়ের দুর্গম গুহা থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা কলকাতায় আসে । তবে, ডিমের কথায় আমার একটু খটকা লাগেনি তা নয় । সাধুরা শুনেছি শুধু ফল-টল খেয়েই থাকে । আশ্চর্যের কথা কী, জানো? সাধুটা তক্ষুনি আমার মনের ভাব টের পেয়ে বলে উঠল,

মুরগির না, হাঁসের ডিম —
দৌড়ে যা, আজ বড্ড হিম ।
দেশের রাজা, তাসের রাজা
এক নাকি রে? দৌড়িয়ে যা ।
সরস্বতীর বাহন হাঁস ।
ভক্তিভরে খাস, যদি পাস ।

রাস্তার ওপারের দোকান থেকে জরদা পান ডিম-রুটি এনে সাধুর সামনে রাখতেই সে শালপাতাসুদ্ধু ডিমের পোচ দুহাতে নিয়ে কপালে ঠেকাল । তারপর 'ব্যোম ভোলেনাথ! জয় শিবশংকর!' বলে হাঁক পেড়ে ভারি যত্ন করে পাউরুটিতে ডিম মাখিয়ে চেটেপুটে খেতে লাগল । খাওয়া শেষ করে কমণ্ডলু থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে পানটা মুখে পুরে দিল । তুমি ভাবছ, এবার আমাকে স্বর্গের পথ বাৎলাতে বসে গেল? অত কী সোজা? সাধুবাবা পান শেষ করে বলল,

পয়সা কিছু খসল বটে, বাট ডু নট রিগ্রেট —
এবার বাছা, খাওয়াও দিকি কিং সাইজের সিগ্রেট ।

ভক্তি পরীক্ষা করছে, বুঝলে না? না হলে সাধুদের আসল জিনিস গাঁজা ছেড়ে কোন দুঃখে সিগারেট খেতে যাবে বলো!

আমি দৌড়ে গিয়ে একটা সিগারেট এনে দিয়ে সাধুজীর পায়ের কাছে বসে পড়ে বললাম, যুধিষ্ঠির যে-পথে স্বর্গে গিয়েছিলেন, সেপথ আপনি ঠিকমতো জানেন নিশ্চয়ই? আমি জগৎসুখ গ্রাম পর্যন্ত জানি । গরমের ছুটিতে মামাদের সঙ্গে মানালি গিয়েছিলাম, হোটেল-বিয়াসের পাশ দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে বিপাশা নদীর ওপারে গিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে গেলে জগৎসুখ গ্রাম । ওই গ্রামের ওপর দিয়ে যুধিষ্ঠিররা গিয়েছিলেন । গ্রামের পর রাস্তাটা কোন দিকে কীভাবে গেছে আপনি জানেন তো?



আমার কথা শুনে সাধু তো রেগে কাঁই। বলল,

জানি না? কী জানি না? না-জানা কী আছে?

ফলে কি গোলাবজামুন কালোজামের গাছে?

— সে তো ঠিকই সাধুবাবা। কিন্তু আপনি সেই পথটা আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন তো?

সাধু এবার একটু সদয় হল। বলল,

সাধুকে সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিস না

আমিই পথ, আমিই পথিক, আমিই তৃষ্ণা।

স্বর্গে যাবার পথ দেখাব, আয় —

কংকরলাল হবেনই সহায়।

বলেই এক ঝটকায় আমাকে কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কংকরলাল আমার শিষ্য, মস্ত বড়ো ব্যবসাদার। বড়বাজারে ফলপট্টিতে তার বিরাট ফলের দোকান। মানালি থেকে লরি বোঝাই আপেল এনে কলকাতায় পাইকিরি বিক্রি করে। রোজই তার লরি যায় মানালি। তাই বলে কি খালি যায়? তুই কি কিছু বুঝলি? কথার অর্থ খুঁজলি? কাল চলে আয় ভোর-ভোর। ব্যবস্থা সব ঠিক তোর। স্বপ্নে সাগর সাঁতরা। কালকে স্বর্গযাত্রা। হা হা হা হা-হা — সঙ্গে নিস টাকা। জয়শংকর, জয় শিব! বন্ধ রাখিস ঠোঁট-জিব!

ঠোঁট-জিব বন্ধ রাখা মানে জানো তো? কারো কাছে মুখ না খোলা। আমার মামাকে তো দেখনি! মামার জেরার চোটে মুখ না খুলে তুমি পার পাবে? তার ওপর সেদিন এমনিতেই বাড়ি ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে।

আউটরাম ঘাটের কাছ থেকে প্রায় দৌড়ে এসে কার্জন পার্কের সামনে দাঁড়াতেই যোধপুর পার্কের মিনিবাস পেয়ে গেলাম। বাড়ি যত কাছে আসছিল মনটাও তত তেতো হয়ে যাচ্ছিল। ভয়ও করছে, আবার রাগও হচ্ছে। মামাকে ভয়, মামার ওপরই রাগ। ফিরতে কেন দেরি হল? পড়তে বসা হয়নি কেন? হাজারো প্রশ্ন। আমার মামার একটা মুখস্থ কথা ছিল — ওরে মুখ্যু, এবছরও ফার্স্ট না হতে পারলে চিরজীবন ঘোড়ার ঘাস কাটতে হবে!

পৃথিবীতে কজন ফার্স্ট হয় বলো তো! সকলের ফার্স্ট হবার দরকারটাই বা কী? যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম—এরা কি কেউ ফার্স্ট বয়? ফার্স্ট হতে আমার বয়ে গেছে! আমি আর পরীক্ষাই দেব না!

তোমাদের বাড়ি, তোমাদের স্কুল, তোমাদের পৃথিবী রইল পড়ে।

আমি আর এসবের মধ্যে নেই। জগৎসুখ পর্যন্ত যখন যেতে পেরেছি, সেখান থেকে আর দু-চারশো কিলোমিটার যেতে পারব না? একটু আস্তে আস্তে হাঁটব, পাহাড়ি রাস্তা তো, হাঁপিয়ে না যাই সেটা প্রথম থেকেই খেয়াল রাখতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে তো বাড়িতে ঢুকলাম। পড়বি তো পড়, মামারই সামনে। মামা যতই ঘোড়ার ঘাস কাটার কথা বলে আর এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলাম তাই নিয়ে জেরা করে, আমি সাধুর উপদেশ মতো ঠোঁট-জিব বন্ধ করে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকি। সেদিনই শেষ রাতে আমি চুপি চুপি দরজা খুলে সোজা আউটরাম ঘাট। ভুল করেছিলাম কী জানো? মামা-মামীকে একটা বিদায়পত্র লিখে এসেছিলাম। চিঠিতে লিখেছিলাম —

আমি মহাপ্রস্থানের পথে যাইতেছি। আর কোনো দিন ফিরিব না। তোমরা আমার বৃথা খোঁজ করিও না।

কী করিয়া স্বর্গে পৌঁছাইব তাহা লইয়াও তোমরা ভাবিও না। এক সাধু আমাকে পথ দেখাইতেছে। এক আপেল ব্যবসায়ী তাহার আপেল আনিবার লরিতে আমাকে অনেক দূর আগাইয়া দিবে। আমার বইখাতা যাহাকে খুশি বিলাইয়া দিও। অথবা কাগজওলাকে বেচিয়া দিতে পারো। উহাতে আমার আর প্রয়োজন নেই।

ইতি বিধান

গৌর মন দিয়ে বিধানদাদার কাহিনি শুনছিল। অনেক জায়গায় তার হাসি পেয়েছে, জোর করে চেপে রেখেছিল। ইতি বিধান — শুনে আর থাকতে না পেরে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, বিধানদাদা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে বলল, আউটরাম ঘাটে আমি ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলাম। সাধুবাবা প্রথমে টাকাগুলো গুনতে গিয়ে দেরি করে ফেলল। তারপর চা-টা খেতে খেতে তো বেলাই হয়ে গেল! ততক্ষণে গন্ধে গন্ধে ঠিক পুলিশ এসে জুটে গেছে!

পাগলদের এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা। অনেক কিছুই মনে করতে পারে না, এমনকী চিনতে পর্যন্ত পারে না, আবার কবেকার কী না কী একবার যদি মনে গেঁথে গেল তো তার আর এক চুল ভুল নেই। কতদিন আগের কথা বিধানদাদা এমন ভাবে বলে গেল যেন গত হপ্তার ঘটনা। ভণ্ড সাধুর ছড়াগুলো পর্যন্ত মুখস্থ! মনের এত ক্ষমতা, অথচ মানুষটা কেমন মরে রয়েছে দ্যাখো দিকি!

গৌর বিধানের মনটা একটু অন্য দিকে ঘোরাবার আশায় বলল, আপনি এত সুন্দর করে বলেন যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি । আপনার উচিত ছিল কথকঠাকুর হওয়া । শুধু কথকঠাকুর হয়েই আপনি পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াতে পারতেন ।

বিধান বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পৃথিবী আমার ভালো লাগে না ।



গৌর বলল, পৃথিবীটা কি আপনার গাছের নারকোল নাকি যে পেড়ে, হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেই ফুরিয়ে গেল? পৃথিবীর কি শেষ আছে? নিজের গাঁ ছেড়ে এসে এ-কদিন কত জায়গায় ঘুরলাম, মনে হয় কত দেখছি — দিশে পাচ্ছি না, কিন্তু পুরো পৃথিবীর তুলনায় এ কতটুকু? মস্ত বড়ো সর্ষেখেতের তুলনায় এক দানা সর্ষে বই তো নয়!

বিধান এবার উৎসাহিত হয়ে বলল, ঘুরছই যখন, চলো না কেন দুজনে মিলে স্বর্গে পৌঁছবার চেষ্টা করি!

গৌর কী ভেবে হঠাৎ সাহস করে বলে ফেলল, বেশ তো, যাওয়া যাবে । তবে আপনি যে ভাবছেন স্বর্গ জগৎসুখ থেকে দু-তিন মাসের পথ, সেটা ঠিক কথা নয়! কেউ যদি আপনাকে বলে থাকে, ভুল বলেছে । জগৎসুখ থেকে স্বর্গ পুরো বারো বছরের রাস্তা । দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা । তার ওপর সারা বছরই বরফে ঢাকা । ভালো মতন তৈরি না হয়ে হুট করে তো আর বেরিয়ে পড়া যায় না ।

— বরফের কথাটা ঠিকই বলেছ । কিন্তু বারো বছরের পথ — তোমাকে কে বলল?

— আহা, আমি যেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি জানি না! পুরো রামায়ণ-মহাভারত আমি গেয়ে শোনাতে পারি ।

— কিন্তু বারো বছর লেগেছিল সেটা তুমি জানলে কী করে?

— মহাভারতের কথা কে না জানে বলুন!

— মহাভারত তো বিরাট বই । এত বড় বই কে তোমাকে পড়তে শেখাল?

— রামায়ণ-মহাভারত আবার শিখতে হয় নাকি? ধরুন গঙ্গা । মহাভারতের থেকেও বিরাট । গঙ্গার কথা কি বলে শেষ করা যায়? তাই বলে গঙ্গা কি কেউ লেখাপড়া করে তবে জানে?

— ঠিক বলছ জগৎসুখ থেকে বারো বছর লাগে? আমার ধারণা ছিল ওখান থেকে দু-তিন মাসের রাস্তা । হয়তো সেই সাধুই একথা বলেছিল, ঠিক মনে পড়ছে না । তা, তুমি কীভাবে তৈরি হতে বলো?

গৌর এবারও দুম করে বলে বসল, প্রথমে তো ভালো করে পাহাড়ে চড়া শিখতে হবে ।

বিধান বাবু হয়ে লম্বা শরীরটা ঝুঁকিয়ে বসেছিল, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, বেশ, তা না হয় শিখলাম । তারপর?

গৌর একটু ভেবে বলল, শীত সহ্য করার অভ্যেস করতে হবে। বারো মাস, তিরিশ দিন ভোরবেলা পুকুরে চান করলে শীতে আর কষ্ট হবে না।

— করব। আর কী করতে হবে বলো।

— আর — আর — আর মন ভালো রাখতে হবে। মন ভালো রাখতে গানের মতো আর কী আছে বলুন! আমি গান গাইব, আপনি শুনবেন।

— একটা গাও।

— একটা কেন, অনেক গান গাইব। গান গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু পাহাড়ে চড়া আমরা শিখব কী করে?

বিধান এত দিনে এই একজনকে পেয়েছে যে তাকে পাগল ভাবে না, ঘরে বন্ধ করে রাখে না, তাকে গান শোনায়, আর সবচেয়ে বড় কথা, তাকে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে সবরকম সাহায্য করতে রাজি। এমনকী গৌর তার সঙ্গে যাবে বলেছে। সে খুব আগ্রহ নিয়ে গৌরের দিকে তাকিয়ে বলল, পাহাড়ে চড়া খুব সহজ কাজ নয়, কিন্তু তুমি একটা ব্যবস্থা ঠিকই করতে পারবে, কী বলো?

— আমি ভাবছি, বলে গৌর বাগানের এদিক-ওদিক চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, প্রথমে আমরা বাগানের ওই ন্যাড়া জায়গাটায় একটা মাটির পাহাড় বানাব। পুকুরপাড় থেকে মাটি কেটে কেটে বেশ বড় একটা পাহাড় হতে পারে। আপনাদের বাড়ির মতো উঁচু হলেই আপাতত চলবে। তারপর রোজ দুজনে এখানেই পাহাড়ে চড়া অভ্যেস করে নেব। তারপর অবশ্য সত্যিকার পাহাড়ে গিয়েও খানিকটা শিখতে হবে।

— বললাম না, তুমি একটা ব্যবস্থা করবেই। ও, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে! ডাব খাবে? মালি — মালি —

মালিদের ডাকতে ডাকতে বিধান বেড়ার দিকে যাচ্ছিল, গৌর তাকে ডেকে বলল, ডাব পরে খাব। এখন বসুন তো, গান গাই।

গৌর আর কথা না বলে গান ধরল। একটার পর একটা সে গেয়ে চলল। বিধান কুঁজো হয়ে বসে দুলে দুলে গান শুনছে। তার মুখ দেখে মনে হয়, সে যা চায়, পেয়ে গেছে। আর কিছু তার চাইবার নেই।

বিধানদাদার সঙ্গে জলাঘাটায় গৌরের কতদিন কেটে গেল গৌর নিজেই জানে না। সে রোজই ভাবে, আর নয়, এবার বেরিয়ে পড়তেই হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বিধানদাদার হাত

ছাড়িয়ে, তার মিনতি এড়িয়ে যাওয়া আর হয় না। মানুষটার ওপর তার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। বিধানদাও গৌর বলতে অজ্ঞান। ভোরবেলা পুকুর সাঁতরে চান করা থেকে শুরু করে পাহাড়ে চড়া, বাগানে বেড়ানো, গান শোনা, গল্প করা — বিধানের দিনগুলো ভারি আনন্দে কেটে যায়।

একদিন এরকম ভোরে উঠে গৌর বিধানদাকে ডাকতে গিয়ে দেখে ঘর খালি, বিধান নেই।

বিধানের বাবা সবে বাগানের কাজ শেষ করে উঠোনে পা দিয়েছেন, গৌরের মুখে বিধানের কথা শুনে নিড়ানি আর সারের প্যাকেট হাতে সেখানেই বসে পড়লেন। ডান হাঁটুর ওপর মাথা রেখে খানিকক্ষণ শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, তীরে এসে আমার তরী ডুবল রে গৌর! ও বাবা বিধান, আবার পালালি বাবা!

গৌর উবু হয়ে বসে বলল, বেশি দূরে যেতে পারেনি নিশ্চয়ই। এখনও গেলে হয়তো পাওয়া যাবে। চলুন, এখন কাঁদবার সময় নয়!

বিধানের বাবা সেইরকম বসে থেকে নিচু গলায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আগে এমন অনেক সয়েছি। কত দূর দূর থেকে ওকে খুঁজে এনেছি। এবার তুমি কী যাদু করেছিলে বাবা। ওকে দেখে বড্ড আশা করে ফেলেছিলাম। আজ আমার হাঁটুর জোড় খুলে গেছে বাবা। আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। তুমি যাও বাবা, দেখো যদি খুঁজে পাও।

গৌর অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, সিঙ্গুরের পথঘাট আমি ভালো চিনি না। আপনি না গেলে বিধানদাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। চলুন, আর দেরি করলে — একবার যদি ট্রেনে চড়ে বসে —

বিধানদার বাবা একভাবে বসে রইলেন। হাঁটুর ওপর মাথাটা চেপে ডাইনে-বাঁয়ে নাড়িয়ে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

গৌর শেষ বারের মতো বোঝাবার চেষ্টা করে অগত্যা একাই বেরতে যাচ্ছে, হঠাৎ কে একজন ভেজানো সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। লোকটার মুখে হাসি।

গৌর অবাক হতে গিয়েও হঠাৎ গোঁফ-দাড়ি কামানো বিধানদাদাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল — দেখুন, দেখুন, আপনার সামনে কে?

বিধানদার বাবা মুখ তুলে নতুন চেহারায় ছেলেকে দেখেই লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে কাদামাখা হাতে তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরলেন। তাঁর নাকি হাঁটুর জোড় খুলে

গেছে, উঠে দাঁড়াবার আর শক্তি নেই!

বিধান এভাবে বাবার বুকে লেপটে থেকে অস্বস্তি বোধ করছিল। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাবার চোখ ভেজা দেখে হেসে ফেলল — আপনি বুঝি ভেবেছিলেন আমি আগের মতো পালিয়ে গেছি?

বিধানের বাবা এবার ভিজে চোখেই হেসে ফেলে বললেন, দূর, তাই আবার কেউ ভাবে নাকি? দাড়ি তো বাড়িতে নাপিত ডেকেও কামানো যেত!

— ভালো কথা, বাবা, স্টেশনের পঞ্চা নাপিতকে আপনি আজ যাবার সময় আট আনা পয়সা দিয়ে যাবেন, আমি বলে এসেছি।

— দোব, দোব বাপ। ওকে আজ একসের মাখা-সন্দেশ কিনে দোব। আর এই গৌরাঙ্গকে যে কী দোব জানি না। তোমার-আমার সব দিয়েও ওর ঋণ শোধ হবে না।

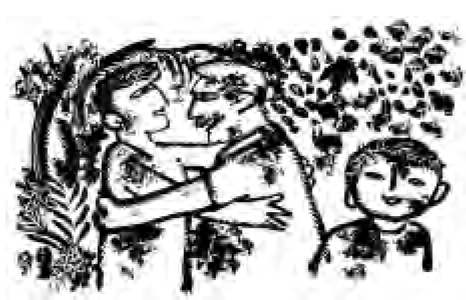
গৌর এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। সে এবার হাসতে হাসতে বলল, বিধানদাদাকে রামের মতো দেখাচ্ছে। আপনি এবার সীতার সন্ধান করুন।

বিধানও হেসে ফেলে বলল, ভালোই তো, তিনজনে একসঙ্গে বনবাসে যাওয়া যাবে।

তারপর বাবার দিকে ফিরে বলল, আমি ভাবছি, এবার একটা কাজে লেগে পড়লে ভালো হয়। কাজকর্ম ছাড়া আর ভালো লাগে না।

— আপিসের চাকরি আর না বাবা। সেবার আপিসের চাকরি করতে গিয়েই তোর মাথাখারাপ হয়েছিল। আমি তোকে সুদামা হাই ইস্কুলের টিচার করে দোব। ও-ইস্কুলবাড়ি তো তোর ঠাকুরদার নামে আমিই করে দিয়েছিলাম।

গৌর বিধানের কাছে এসে বলল, ছোটবেলা থেকে বড্ড ইচ্ছে সকলের মতো ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করি। তা আর হল না। আপনি ইস্কুলের মাস্টারমশাই হলে, আমি যখন ফিরে আসব, আমাকে লেখাপড়া শেখাবেন।



— তুমি যাচ্ছ কোথায় যে ফিরবে? আমাদের বাড়িতে থেকে আমাদের স্কুলে তোমাকে পড়তে হবে। হেড মাস্টারমশাইকে বলে গৌরকে কালই ভর্তি করে দিন তো বাবা।

— কথাটা ভালো মনে করেছ। খুব ভালো কথা বললে।

— বিধানদাদা বিধান তো ভালোই দিয়েছেন। কিন্তু এবারের মতো আমাকে বিদায় দিন। একবার যখন নিজের গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছি, কিছুদিন ঘুরে বেড়াই, তারপর ঠিক ফিরে আসব। লেখাপড়ার জন্যও মন তো কাঁদে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

— ঠিক ফিরবে তো?

কথাটা জিজ্ঞেস করেই বিধানদাদা তার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে দেখে গৌর বলল, না ফিরলে তো আমার কথাই ফিরিয়ে নেওয়া হবে। গুলতির ঢিল আর মুখের কথা কি ফেরানো যায়?

— কথাটা মনে রেখো। চলো, তোমাকে রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

স্টেশনে এসে বিধান জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তারকেশ্বরে যাবে, না হাওড়ার দিকে?

— একদিকে গেলেই হয়। আমার যেতেই ভালো লাগে।

কথাটা শুনে বিধান অবাক হয়ে ভাবছে দেখে গৌর আবার বলল, ভাবুন তো, কত দিকে কত পথ চলে গেছে! নিজের গাঁ ছেড়ে না বেরলে আমি তো জানতেই পারতাম না এত বড় একটা পৃথিবীতে আমরা থাকি!

এপাশে ওপাশে যাত্রীদের ভিড়ে চোখ বুলিয়ে বিধান বলল, চলেই যখন যাবে, একটা গান শুনিয়ে যাও!

গৌরকে গানের কথা দুবার বলতে হয় না। একহাতে কান চেপে বিধানের দিকে আর-এক হাত মেলে দিয়ে গান ধরল—

রাবণবধের শেষে

ও রাম, যাও গো নিজের দেশে

জলাঘাটার কোথায় যে কোন কোণে

কাঁদেন সীতা একলা অশোকবনে

ও রাম, লাগাও দেখি হাঁটা

তোমার দেশ তো জলাঘাটা

ও রাম—

গানের মধ্যেই প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে হুড়মুড় করে তারকেশ্বরের ট্রেন এসে পড়ল ।

যারা হাওড়ার দিক থেকে সিঙ্গুরে আসছে, তারা নামবার জন্য ট্রেনের দরজায় দরজায় ভিড় করে আছে, ট্রেন ভালো করে থামবার আগেই নুন লাগা জোঁকের মতো টুপ টুপ করে প্ল্যাটফর্মে খসে পড়ে এদিক-ওদিক ছিটকে যেতে লাগল । যারা এখান থেকে তারকেশ্বর বা ওই দিকে যাবে তারাও একইসঙ্গে ট্রেনে ওঠবার জন্য এ-দরজা ও-দরজার দিকে চার-ফেলা জলে মাছের ঝাঁকের মতো দৌড়োদৌড়ি করছে ।

বিধানও গৌরের জন্য একটু কম ভিড়ের কামরার খোঁজে ব্যস্ত, তার মধ্যেই ট্রেন ভোঁ বাঁজিয়ে স্টেশনের ধুলো উড়িয়ে ছেড়ে গেল ।

গৌরকে কোথাও দেখা গেল না ।

ভিড় দেখে গৌর প্রথমে ভেবেছিল চলন্ত রেলগাড়ির মধ্যে বোধহয় বড় মেলা বসেছে বা হয়তো ভরা হাট । তারপর ওঠা-নামার ছোটাছুটি দেখে যে-ই বুঝল— এ তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, অমনই সে উল্টো দিকের রেললাইন পেরিয়ে সারি সারি কুঁড়ে ঘর ছাড়িয়ে দিগন্ত-ছোঁয়া কলাবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল ।

কলাগাছগুলো মাথায় লম্বা না, বরং খুবই বেঁটে । গাছ থেকে শুকনো কলাপাতায় মোড়া কলার কাঁদি ঝুলছে । অনেক কাঁদিই এত বড় যে মাটিতে ঠেকে গেছে ।

যতক্ষণ দিনের আলো ততক্ষণ কলাগাছের ভিড়ের মধ্যে পায়ে-চলার পথ দেখা যায় । কখনও সোজা, কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে, যখন যে-দিকটায় মন সায় দেয় তখন সেই পথ ধরেই গৌর এগোতে লাগল ।

কলাগাছের শেষ দেখা যাচ্ছে না । তার মধ্যেই ঝুপ করে সন্ধে নামল । প্রথমে একটা হুক্কাহুয়া, তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার শেয়ালের ডাকে কানে তালা লাগবার জোগাড় । গৌর দু-কান চেপে ভাবতে লাগল, কোন দিকে এগোলে দুটো-একটা ঘরবাড়ি পাওয়া যাবে ।

একসময় বেঁটে কলাগাছের বাগান শেষ হয়ে লম্বা কলাগাছের ঝাড় শুরু হল । দুদিন পরেই অমাবস্যা । অন্ধকারে আলাদা করে একটা গাছও আর দেখা যায় না । দু-চার পা এগোতে গেলেই গাছের সঙ্গে ধাক্কা । ধাক্কা খেয়ে গৌর একবার কলাগাছের ঝোপের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল । পুরো কলাবাগান যতদূর চোখ যায়, কয়লার মতো নিরেট কালো

হয়ে আছে। আলো বলতে, কলাগাছের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি। তারও ওপর আকাশ তারায় গিজগিজ করছে।

গৌর কোনওদিকেই আর এগোবার চেষ্টা না করে একহাতে কান চেপে গলা আকাশে তুলে গান ধরল—

একমুঠো শাক-ভাত

মাথার ওপর ছাত

আজকে রাতের মতন শুধু চাই

কে দেবে ভাই কে দেবে ভাই কে দেবে ভাই!

একমুঠো শাক-ভাত

মাথার ওপর ছাত—

এত বড় কলাবাগানে কেউ কি তার কথা শুনতে পাচ্ছে? কেউ কি আছে কোথাও? দিনের বেলায়ই কলাখেতের কোনও দিকে কোনও শেষ দেখা যায়নি, রাতের অন্ধকারে তারা-গিজগিজে আকাশ যতদূর গেছে, কলাখেতও মনে হয় তত দূর জুড়ে আছে।

অন্ধকার কলাবাগানের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা বাঁচিয়ে গৌর যেদিকে যতটা পারল এগিয়ে এবার আরও জোরে গাইতে লাগল—

কে আছো ভাই, একটা রাতের তরে

থাকতে আমায় দেবে মাটির ঘরে?

একমুঠো শাক-ভাত

মাথার ওপর ছাত

কে আছো ভাই—



গান গৌরের গলায় আটকে রইল, অন্ধকার ফুঁড়ে একটা লোক এসে তার সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, তুই কি রাজমিস্তিরি-পাড়ার ছেলে?

— রাজমিস্তিরি-পাড়া? আমি তো কখনও নামই শুনিনি।

আরও তিনজন এসে গৌরকে ঘিরে ধরেছে। প্রথম লোকটা হঠাৎ খুব রেগে চেঁচিয়ে উঠল— তাহলে নিজের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?

— পালাব কেন? গ্রাম ছেড়েছি পৃথিবীটা একটু দেখব বলে।

আরেক জন এগিয়ে এসে বলল, তুই কি ভিখিরি-বোষ্টম, না বেদের দলের ছেলে? রাতের বেলা কলাখেতে ভাত ভাত করে চেঁচাচ্ছিস কেন? যাচ্ছিসই বা কোথায়?

— সে তো জানি না। হাঁটতে হাঁটতে যেদিন যেখানে গিয়ে পৌঁছই সেদিন সেখানেই যাই।

হঠাৎ দুজন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গৌরের দুহাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, চ' আমাদের সঙ্গে। যদি রাজমিস্তিরি-পাড়ার ছেলে না হোস কাল-পরশু ছাড়া পাবি।

লোক-দুটোর শেষ কথাটা ঠিক ঠিক শুনতে পায়নি, দুজনের মুঠোর চাপে তার দুহাতের কব্জি টাটাচ্ছে, তবু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, আমাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

— ধরে নে, যমের বাড়ি।

গৌর এবার আরও শান্ত গলায় বলল, সেখানে তো জীবৎকালে কেউ কাউকে নিয়ে যেতে পারে না।

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে হেসে উঠল।

গৌরের ডান হাত যার হাতে ধরা ছিল, সেই লোকটা আরও জোরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, সে-ব্যবস্থাও আমরাই করে দেব।

অন্ধকারে আরেকজন কেউ বলে উঠল, এ নিশ্চই মিস্তিরি-পাড়ার হেডমিস্তিরির ছেলে! কথার তেজখানা দেখেছ! পেট থেকে কথা টেনে বের না করি তো আমার নাম পেটকাটা ন্যাপলা না!

গৌরের বাঁ-হাত ধরে থাকা লোকটা বলল, আরে যা! চোখই বাঁধা হয়নি! দে তো গামছাটা—

এবার প্রথমজনের গলা— বুদ্ধিটা তোর একবারে কাদাগোলা, অন্ধকার দিয়ে ভগবানই তো ওর চোখ বেঁধে দিয়েছে।

কলাপাতার ঘষা খেতে খেতে লোকগুলো অনেকক্ষণ সোজা এগোবার পর এক জায়গায় বাঁদিকে ঘুরল। একটু পরেই একই পথে ফিরে এসে এবার ডান দিক ধরল।

অন্ধকারে চোখে না দেখলেও প্রথম লোকটার উদ্দেশে গৌর বলল, আপনি তখন ভগবানের নাম নিলেন, ভগবান কে আপনি জানেন?

লোকটা এবার গৌরের কাছে এগিয়ে এসে বলল, ভগবানকে কে না জানে! সবাই জানে।

গৌর বেখেয়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি তো দেখি উল্টো। বেশির ভাগ লোকই ভগবানকে জানে না। যেমন আপনারা।

গৌরের হাত-ধরা লোক-দুটো জোর হ্যাঁচকায় তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে বলল, আমরা কে, তুই জানিস?

— সঠিক জানি না, মনে হয় রাক্ষস।

— রাক্ষসরা কীর'ম হয় জানিস তো!

বলে প্রথম লোকটা এক লাফে গৌরের সামনে পড়ে হুংকার দিল— মুন্ডুটা তোর এক কোপে ফেলে দিলে ফের গজাবে? রাক্ষসরাজ রাবণের মুন্ডু দশবার কাটলে দশবার গজাবে!

ন্যাপলার বুদ্ধি যত কম রাগ তত বেশি, সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আজ রাতেই রাজমিস্তিরি-পাড়া তোলপাড় করব। আজও যদি হেডমিস্তিরির গর্তের হদিশ না পাই তোর

মুন্ডু কলাপাতায় মুড়ে তোর বাপকে দিয়ে আসব!

আবার কলাখেত কাঁপিয়ে শেয়ালের পাল ডেকে ওঠায় শেষ কথাগুলো গৌরের কানে ঢুকেছে কিনা বোঝা গেল না, রামায়ণের এককণা কথাতেই তার গলায় গান ঠেলে উঠেছে। এক ঝটকায় একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কান চাপা দিয়ে সে গেয়ে উঠল—



ও রাবণ, তুই এ কী শিক্ষে দিলি!

ও তুই, এ কী শিক্ষে নিলি—

মানুষ— মানুষরে—

তুই এ কী শিক্ষে নিলি!

লক্ষ কোটি মানুষ দেখি

কোটি কোটি প্রাণী

কেউ পেরেছে কাউকে দিতে

কারও মুন্ডুখানি?

টিকটিকি না, পিঁপড়েও না, আরশোলারও না

কেউ পারেনি গড়তে রে ভাই কারোরই মাথা—

তুমি মুন্ডু নেবার কে!

কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারও মুখে কথাও নেই, সবাই যেন গৌরের গানের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। দলের এই অবস্থা দেখে শুধু পেটকাটা ন্যাপলা বলে উঠল, ছোকরা সকলের ওপর বশীকরণ মন্তর ছেটালো নাকি গো? সব যে এগবারে বোবা মেরে গেলে?

যে লোকটা এককোপে গৌরের মুন্ডু ফেলার কথা বলেছিল সে বলল, এ তো যেমন-তেমন মানুষ নয় রে। তুই কে বল তো? তোর নাম কী?

— সবাই আমাকে গৌর বলে ডাকে ।

দলের একজন এই প্রথম গৌরের কাছে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, অন্ধকারে চিনতে পারিনি, তুমি সেই? রামায়ণ-গাওয়া গৌর? আমি পচা । দোলপুন্নিমেয় বাপের প্রাণদণ্ড থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে!

গৌর কিছু বলবার আগে লোকটা অন্যদের উদ্দেশে গলা তুলে বলল, একবার যখন দেখা পেয়েচি আর ছাড়চি না । রামায়ণ গেয়ে আমার দণ্ড মকুব করিয়েছিল । এনারে আমাদের দলে রাখলে আমাদের সুখ্যাতি হবে ।

গৌর রাগে-দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল, আপনারা ডাকাত? শেষ অব্দি ডাকাত-ই হলেন পচাবাবু? আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব না!

একটা লোক পিছন থেকে গৌরের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, তুই যাবি না, তোর ঘাড় যাবে! চল!

পচা কিছু বলতে যাচ্ছিল, লোকটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুই কীভাবে চিনলি একে? এ তো কালসাপের বাচ্চা! এ নিশ্চয়ই হেডমিস্তিরির ছেলে!

গৌরকে এবারও ধাক্কা মারতে মারতে বলল, চল ব্যাটা চল, আজ রাতেই রাজমিস্তিরি-পাড়ার ধোঁকাবাজির ফয়সালা হবে!

২

ধু ধু কলাখেতে দাঁড়িয়ে দূর গ্রামের আন্দাজ পাওয়া দিনের বেলা যত সহজ, রাতের আঁধারে তত সহজ নয় । দিনের বেলা দূর থেকে কয়েকটা বড় গাছ দেখতে পেলে বা গোরুর হাম্বা কানে এলে বোঝা যায় কাছেই গ্রাম আছে । তা সে তেঁতুল গাছ বা শিরীষ গাছ বা নারকোল গাছ বা আম-জাম-কাঁঠালের গাছ যা-ই হোক না । হাম্বাও একটা গোরুর হোক বা একপাল গোরুর— গোরু থাকলে গ্রামও থাকে ।

রাতের অন্ধকারে গ্রাম বোঝার সে-সুযোগ নেই । তার ওপর সামনেই অমাবস্যা । কলাখেতের জমাট-বাঁধা অন্ধকারে ডাকাতদেরও বার বার পথ ভুল হয়ে যাচ্ছে । জোনাকির ঝাঁক দেখে কাছে গিয়ে দেখা যায় কোথায় গাছপালা, কোথায় ঝোপঝাড়? তারা ওড়াউড়ি করছে বিরাট এই কলাখেতেরই একটা অংশে ।

ডাকাতরা কাছে যেতে জোনাকির ঝাঁকও এদিক-ওদিক ছিটকে যায় । এরকম বেশ কয়েক বার জোনাকির চিহ্ন ধরে রাজমিস্তিরি-পাড়া খোঁজার চেষ্টা বৃথা হতে দেখে ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করল । রাজমিস্তিরি-পাড়ায় তারা আজ নতুন যাচ্ছে না, গত অমাবস্যার রাত থেকে রোজ রাতে তারা ওই গ্রামে হানা দিচ্ছে, গতকালও তারা গ্রামের মা-বউদের শাসিয়ে এসেছে । আজ তাহলে সঠিক রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এই ভুলের জন্য একজন আরেকজনকে দায়ী করে গালমন্দ করে চলেছে ।

কলাখেত আসলে বিরাট একটা উল্টোনো গোলোকধাঁধা । গোলোকধাঁধায় ঢোকবার দরজা দিয়ে ঢুকে খুঁজে খুঁজে বহু দিক ঘুরে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়, এই কলাখেতে তার উল্টো । একবার ঢুকলে এখান থেকে বেরবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া সহজ নয় । কলাখেতের সব চাষি মিলে কলাচোরদের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য এইভাবে খেতের রাস্তা দিয়ে ধাঁধা বানিয়ে রেখেছে । দিনের আলোয় রাস্তার ধাঁধার মধ্যে না ঢুকেও কলাগাছের গা ঘেঁষে, ধাক্কা বাঁচিয়ে, যদি বা এগনো যায়, রাতে তার উপায় নেই ।

গৌরের খুব খিদে পেয়েছে । তাছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা এমন দিশাহীন দেশহীন পাগলের মতো হাঁটা যায় নাকি!

ডাকাতরা একবার এদিক, একবার ওদিক ঘুরে মরছে আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেই চলেছে দেখে গৌর তার হাত ধরে থাকা লোক-দুটোকে বলল, রাজমিস্তিরি-পাড়া

এই কলাখেতের কোন দিকে পড়বে তোমরা জানো?

পচা গৌরের সঙ্গ ছাড়েনি । তার প্রশ্নটা কিছুটা গর্বিত স্বরে দলের অন্যদের সে-ই শুনিয়ে দিল ।

সর্দারের কাছে জানা গেল, কলাখেতের উত্তর সীমা ছাড়িয়ে পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামের একটা গ্রাম রাজমিস্তিরি-পাড়া! রোজই রাতে তারা সেখানে যায়, রোজই কলাখেত পার হবার সময়ে নতুন করে পথ খুঁজতে হয় ।

গৌর অনেকক্ষণ আকাশের তারা দেখল । অন্ধকার আকাশে কালপুরুষ ধ্রুবতারা সব মাজা কাঁসার বাসনের মতো ঝকমক করছে । সপ্তর্ষিও দেখা যাচ্ছে, তবে তত উজ্জ্বল নয় ।

মনে মনে দিক হিসেব করে গৌর বলল, তোমরা আমার হাত ছেড়ে দাও । আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাদের ওই গ্রামের দিকে নিয়ে যেতে পারি ।

পচা আনন্দে তালি বাজিয়ে দিল । অন্ধকারে বোঝা গেল না, বোধহয় দু-তিন বার লাফিয়েও উঠল । তারপর বলল, বলেছিলাম না, জ্ঞানে-গানে গৌর আমাদের ভারি ওস্তাদ! আমারে ডাকাতির দলে যেতে নিষেধ করেছিলেন!

মাঝরাতে ডাকাতের দল গ্রামের মানুষের বুকে কাঁপন ধরিয়ে রাজমিস্তিরি-পাড়ায় ঢুকল ।

ঘরের ভেতরে, বাইরে কান্না ছাড়া আর শব্দ নেই । বাড়ির বউ আর বুড়ো-বুড়িরা কেউ বসে কেউ শুয়ে শুধু কাঁদছে । অনেকে ভয়ে চুপ করে আছে । বেশির ভাগ ঘরে কোনও বয়স্ক পুরুষমানুষ নেই । ছোটরা যারা তখনও ঘুমোয়নি, বড়দের দেখাদেখি তারাও কাঁদছে ।



— মিস্তিরিগুলো কদ্দিন পালিয়ে বেড়াবে! এখনও অনেকের মোহরের হদিশ পাইনি, আজ না পেলে আর কাউকে ছাড়ব না! হেডমিস্তিরির গর্তটা কোথায় বল শিগগির! তার মোহরগুলো না পেলে তার বুড়ো বাপকে আজ ধরে নিয়ে যাব।

ডাকাতের দল সব ঘরেই একই কথা বলে হুমকি দিতে লাগল।

ঘরের মেয়েরা-বউরাও সবাই কাঁদতে কাঁদতে একই কথা জানায়— মিস্তিরিরা যা মোহর পেয়েছিল, ডাকাতরা এ-কদিনে তার সবই নিয়ে গেছে। দুয়েকজনের গর্তে এখনও যদি দুয়েকটা পড়ে থাকে, ঘরের লোক ফিরে এলে মেয়েরাই তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে লুকনো গর্ত খুঁড়ে সেগুলো বের করে দেবে। ডাকাতদের ভয়ে তারা ঘরেই ফিরতে পারছে না।

— হেডমিস্তিরির গর্তটা কোনদিকে দেখাও। নাহলে আজ আর কাউকে ছাড়ব না। আমার কাছে খবর আছে মানকুণ্ডুর রাজবাড়ি ভাঙবার সময় চোরাকুঠুরি থেকে মোগলবাদশাদের আমলের শয়ে শয়ে মোহর পাওয়া গেছে। এ-পাড়ার মিস্তিরিরাই সেখানে রাজবাড়ি ভাঙার কাজ করছিল। বেশিটাই মালিকদের লুকিয়ে মিস্তিরিরাই নিয়েছে। কলসি কলসি সেসব সোনার টাকা আমাদের চাই।

ডাকাতের দল যত ভয় দেখায়, গ্রামের মানুষ তত কাঁদে। যে ক'জন ডাকাতদের মার খেয়ে আগেই সজনেতলায়, মানকচু-জঙ্গলে, কদবেলগাছের আড়ালে লুকনো গর্ত খুঁড়ে তাদের মোহর ডাকাতদের হাতে তুলে দিয়েছে, তারাও ডাকাত দেখে ভয়ে কাঁপছে। যারা তখনও মোহর ফেরত দেয়নি, তারা চুপি চুপি গ্রামে ফিরে আসছিল, দূর থেকে ঘরের মেয়েদের কান্নার শব্দ শুনেই উল্টো পথে দৌড় লাগাল।

দলপতির ইঙ্গিতে একজন ডাকাত হঠাৎ একটা ঘুমন্ত ছেলের ঠ্যাং ধরে টেনে তুলতে ছেলেটা ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তাই দেখে ঘরের অন্যরা এবার আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

পরপর কয়েকটা ঘরে ডাকাতদের বুক-কাঁপানো হুমকি ও ঘরের লোকের কাতর অনুনয়-বিনয় শুনে পুরো ঘটনাটা গৌরের কাছে কালবোশেখের ঝড় ওঠবার ঠিক আগের আকাশের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

ডাকাতেরা একটা ঘরে হুমকি দিয়ে বেরনোমাত্র সে দলের সর্দারকে বলল, খামোখা সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? ওরা ভয় পেলে কি আপনারা মোহর পাবেন?

— চোপ! রাস্তা বাৎলে দিয়েছিস বলে তুই কি আমাদের ওপর সর্দারি করবি নাকি?

— ডাকাতদলের সর্দারি করা বুঝি খুব আনন্দের? নাকি কাজটা খুব ভালো?

এইসময় পচা এগিয়ে এসে বলল, না না, গৌর তো আমাকেই ডাকাতিতে আসতে বারণ করেছিল ।

দলপতি এবারও রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, গৌর হঠাৎ একহাতে কান চেপে গেয়ে উঠল—

চুপ চুপ চুপ!

জীবন অন্ধকূপ?

টানলে কেন ঠ্যাং?

তোমরা কুয়োর ব্যাঙ!

রাত দুপুরে মারবে নাকি

পাখির বাসায় বাচ্চা পাখি!

কী দোষ? কী দোষ? কী দোষ?

ভয়ের চোটে কাঁপছে গ্রামের গোরু ছাগল মোষ

গানের মধ্যে এমন কথা কেউ আগে শোনেনি । ডাকাতরা না, গ্রামের লোকেরাও না । তার ওপর সুরের মায়ায়, গৌরের মিঠে গলায় সবাই বেশ অবাক!

ডাকাতরা হুমকি দিতে ভুলে গেছে, যারা ভয়ে কাঁদছিল তারাও আর কাঁদছে না । দলপতি মুখ খোলার আগেই গান থামিয়ে গৌর বলল, আমাকে তিনদিন সময় দিন, এ গাঁয়ের সব লুকোনো মোহর আমিই আপনাদের হাতে তুলে দেব ।

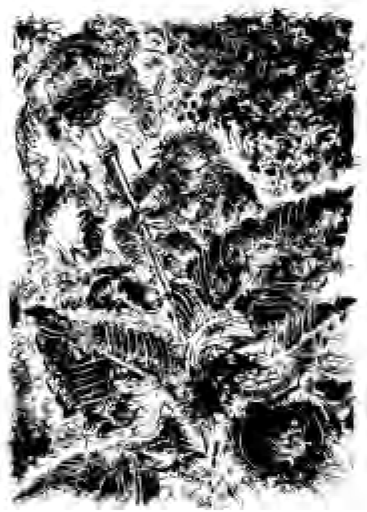
লোকটা রাগ চেপে রেখে বলল, তুই কি থানার দারোগা নাকি রে? বড় বড় কথা বলছিস, তুই এদের চিনিস?

— দুঃখী লোককে আবার আগে থেকে চিনতে হয় নাকি? এদের চোখের জলই তো এদের মনের আয়না! আপনারা এবার যান, একটু মানুষের মতো হাসতে দিন এদের ।

ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে খুব একচোট পরামর্শ করে নিয়ে তাদের সর্দারের কানে কানে কী বলল ।

যারা ঝোপে-জঙ্গলে লুকনো মোহরের খোঁজে গর্ত খোঁড়া থামিয়ে গান শুনতে এগিয়ে এসেছিল তারাও সর্দারকে জানাল, এভাবে আন্দাজে সারা গ্রাম খুঁড়ে ফেললেও কিছু পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ ।

সব দিক ভেবে দলের বেশির ভাগ লোক গৌরের ব্যবস্থাটাই ভালো মনে করল । সর্দারের তবু মনের সন্দেহ যায় না । গৌরের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, তোকে বিশ্বাস কী? ধর, সব মোহর তোর হাতে এল, সবগুলোই তুই আমাদের দিবি তার কী গ্যান্টি? আবার সবগুলোই যে খাঁটি সোনার আসল মোহর তারই বা গ্যান্টি কী? আমি কিন্তু সোনার ঝকমকানি চিনি ।



পচা না বলে থাকতে পারল না— গৌর মিথ্যে কথা বলে না সর্দার ।

গৌর বিরক্ত হয়ে বলল, সোনার ঝকমকানি আপনারা দেখেই নেবেন । এখন যান তো, আমাকে এদের মুখের হাসিটুকু দেখতে দিন । সোনার ঝকমকানি তো তার কাছে পুরনো পেতল!

ডাকাতরা গ্রাম ছাড়তেই ওই অন্ধকার রাতেও গ্রামের মানুষ যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে হইচই ফেলে দিল । ডাকাতরা মোহর খুঁজতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে দুটো মেটে আলু পেয়ে ফেলে রেখে গেছে । গ্রামের বউরা সেই মেটে আলু একহাঁড়ি দুধের-সর চালের সঙ্গে সেদ্ধ করে গৌরকে পেট ভরে খাওয়াল । সঙ্গে বড় কাঁসার বাটি-ভর্তি দুধ আর খেতের পাকা কলা ।

পরদিন ভোরে গ্রামের বাইরে গিয়ে গৌর কান চেপে আকাশের দিকে মুখ তুলে গলার জোরে গান ধরল—

তোমরা যারা গ্রামছাড়া—

বাছুর যেন গো মা-হারা—

ফেরো গো, ফেরো গো, ফেরো ঘরে

মাছি নেই আর দুধের সরে

ফেরো গো ফেরো গো ফেরো ঘরে ।

গান গেয়ে গৌর, ডাকাত ধরে ।

একবার এদিকে একবার ওদিকে গিয়ে, কখনও এমুখে কখনও ওমুখে দাঁড়িয়ে গৌর গলা তুলে গানটা বার বার গেয়ে চলল ।

সন্ধের আগেই গ্রাম-পালানো সবাই একে একে গ্রামে ফিরল । সবশেষে, পশ্চিমের তালসারির আড়ালে সূর্য যখন হারিয়ে গিয়েও আকাশে লাল রং ছড়াচ্ছে তখন হেডমিস্তিরি এক কাঁধে তার পোষা বেজি আর অন্য কাঁধে এক কাঁদি কলা নিয়ে ফিরে এল ।

যখনই কেউ গ্রামে ফিরছে সবাই মিলে তাকে গৌরের কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে । ছেলেটার যেমন মুখের কথা, তেমনই গলার গান, আর মনটা যেন ডিমে তা দেওয়া বাজপাখি ।

রাজমিস্তিরি-পাড়া, নামে পাড়া হলেও, আসলে একটা গ্রাম । তবে খুবই ছোট গ্রাম । গৌর বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে ভয়ে যেন সবাই বোবা হয়ে আছে । কলাচাষি বাদে এ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ রাজমিস্তিরি বা তাদের 'যোগাড়ে' । আর আছে কয়েক ঘর সান্ত্রাস, বহুকালের পুরনো বাড়ির জায়গায় নতুন বাড়ি তোলবার আগে পুরনো বাড়ি ভাঙার কাজটা এরাই করে । কয়েক ঘর 'মিতা'ও আছে, তারাও মিস্তিরি-যোগাড়েদের সঙ্গে রোজ ভোরে কাজের খোঁজে বেরয় । কোন্নগর, চন্দননগর, মানকুণ্ডু, বলাগড়, ধনেখালিতে কারও বাড়ির ডোবা-পুকুর পরিষ্কার করা, মাটিকাটা, বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেদিন যেমন কাজ জোটে করে । তাতে যা পয়সা পায় তা দিয়ে তাদের ঘরে দু-বেলা ভাত হয় না । মিতারা গৌরকে পেয়ে যখন তাদের এইসব দুঃখের কথা শোনাচ্ছিল তখন গৌরের চোখের কোনে জল চিকচিক করছে ।

রাজমিস্তিরি আর তাদের যোগাড়েদের ঘরে গিয়েও গৌর তাদের বিপদের কথা মন দিয়ে শুনল । সন্ধের মুখে গ্রামের সবাইকে মস্ত বড় খোলা উঠোনে ডেকে গৌর বলল, আপনাদের গ্রামখানা যেন মরে আছে । সবাই এবার মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলুন দিকি!

হেডমিস্তিরির বাবা লাঠি ঠুকে ঠুকে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এসে বলল, তুমি যে ডাকাতদের সব মোহর ফিরিয়ে দেবে বললে সেটা কি সত্যি বললে?

ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে হেডমিস্তিরি বলে উঠল, তুই যে ডাকাতদের দলের নোস, তার বিশ্বেস কী? মোহর ফিরিয়ে দেবার গ্যান্টি তুই দিলি কীভাবে! কে কোথায় নুক্যে রেখেছে, তুই জানিস নাকি?

গৌর শান্তভাবে লোকটার কথা শুনছিল, দুজন সান্ত্রাস গৌরের মুখের কাছে তর্জনী তুলে প্রায় একসঙ্গে বলতে লাগল, বাড়ি ভাঙার সময় মেঝে খুঁড়ে আমরা মোহর পেয়েছি, মিস্তিরি মজুররা যে যার পাওনা ভাগ করে নিয়েছি, আমাদের মোহর ডাকাতদের দেবার কথা উঠছে কী করে?

হেডমিস্তিরির খোঁড়া ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, ডাকাতদের হয়ে ফোঁপরদালালি করার অধিকার তোকে কে দিয়েছে?

আরেকজন বলল, তুই এদের দালাল, না দলের ছেলে?

এবার অনেকেই গৌরকে ঘিরে ধরে বলতে লাগল, ডাকাতরা আমাদের মেরে-ধরে প্রায় সবই লুটে নিয়েছে, এখনও যার যে-কটা মোহর আছে সেগুলো ফেরত দেব কেন?

একজন মাঝবয়সি অন্ধ লোক হাতড়ে হাতড়ে গৌরের কাছে ঘেঁষে এসে বলল, তোমার কথাগুলান ভালো, গানগুলান ভালো, তা বলে তোমার সব কথা শুনতে হবে নাকি?

৩

গৌর কারও কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হেডমিস্তিরির বাবাকে বলল, আপনার ছেলে দেখলাম বেশ বড় এককাঁদি পাকা কলা নিয়ে ফিরল । কাল সবাই আপনারা ভোর-ভোর যে যত পারেন সোনার বরণ পাকা কলা জোগাড় করে আনুন । কাল এখানে কলা-উৎসব হবে । সবার মনের ভয় ওই উৎসবের বাতাসে দেখবেন কুটোর মতো উড়ে যাবে!

কলা-উৎসবের কথা এ গ্রামের কেউ কখনও শোনেনি, গৌর নিজেও আগে ভাবেনি । এ গ্রামে আসার পথে আকাশের মতো অপার কলাখেত দেখেই বোধহয় কলা-উৎসবের কথা তার মনে এসেছে । কল্পনার সেই কলা-উৎসবের কথা গ্রামের সবাইকে বানিয়ে বানিয়ে বলতে বলতে গৌর হঠাৎই কথা থামিয়ে গেয়ে উঠল—

কীসের এত ভয়?
কীসের এত ভয় গো সবার
কীসের এত ভয়?
সোনার বরণ কলার কাঁদি
তাই দেখে ভাই এ-গান বাঁধি
কীসের এত ভয়?

চেঁচামেচি থামিয়ে সবাই মন দিয়ে গান শুনছে, কেউ কেউ আবার গানের তালে তালে দুলছে দেখে গৌর গেয়েই চলল—

কীসের এত লোভ?
কীসের এত লোভ গো সবার
কীসের এত লোভ?
লোভ হলো গে কেরাছিনের ইসটোভ
ফাটলে আগুন— জ্বাল্যে পুড়্যে মারে

তবু তো হুঁশ হয় না রে, হয় না রে
আগুন ছেড়ে আলোর মধ্যে ডোব
লোভ হলো গে কেরাছিনের ইসটোভ

কীসের এত লোভ?
কীসের এত লোভ গো সবার
কীসের এত লোভ?
সোনা ফেলে সুখের মধ্যে ডোব
সুখ শান্তি আসল জিনিস, তাতেই পাবি সব
কালকে হবে কদলী-উৎসব ।

কীসের এত লোভ!
আমায় যত বকো মারো, গানের অর্থ খুঁজো
কালকে গ্রামে করবে অভয়পুজো

সবাই গুঞ্জন করে উঠল, অভয়পুজো— সেটা আবার কী?

কেউ কেউ বলল, কদলী-উৎসবই বা কী?

গৌর যেমন যেমন মনে এল বলে গেল— পাকা কলা দিয়ে যত রকম খাবার বানাতে পারো, সকাল থেকে সবাই মিলে বানাও । কলার শরবত, কলার পায়েস, কলার পিঠে । কলার সঙ্গে নারকোল দিয়ে, বা দুধ দিয়ে, বা দই দিয়ে, আটা বা ডালবাটা মেখে মধু বা লেবু বা তুলসিপাতা দিয়ে কলার হাজারো মিষ্টি বানাতে হবে । তারপর সেসব কলাপাতায় সাজিয়ে সবাইকে খাওয়াও । আশপাশের সব গ্রামের সবাইকে নেমন্তন্ন করো । কাক কুকুর বিড়াল বেজিকেও ভাগ দিও ।



শুনতে শুনতে গ্রামের মানুষের চোখে-মুখে খুশি, মনে উৎসাহ এল। কেউ কেউ আবার জিজ্ঞেস করল, অভয়পুজো কী করে করতে হয়?

গৌর বলল, কদলী-উৎসবে সবাই যখন ভিড় করে এসে কলার মহিমে দেখে মুগ্ধ হবে, একই কলার এত রূপ চেখে আনন্দ পাবে, তাতেই তোমাদের গাঁয়ের মানুষের ভয়ডর ভেঙে যাবে। কলা-উৎসবেরই আরেকটা নাম দিলাম অভয়পুজো।

হেডমিস্তিরি গৌরকে এর আগে 'তুই তুই' করে কথা বলছিল, এবার বলল, তুমি যে ডাকাতদের তিনদিন সময় দিয়েছ, কাল তো তার শেষ দিন। কাল রাতে নিশ্চয়ই ওরা মোহর নিতে আসবে। তখন কী হবে?

হেডমিস্তিরির বাবা বলল, অভয়পুজোর ফলস্বরূপ তখনও আমরা ভয় পাব না?

গৌর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওদেরও কলাপাতায় কলার মিষ্টি সাজিয়ে দিও। লুটের মোহর তোমাদের যার কাছে যা আছে তাও সব একটা কলাপাতায় করে ওদের সামনে ধরে দিও।

হেডমিস্তিরি আগের মতোই রাগে চেঁচিয়ে উঠল— লুটের? লুটের আবার কী? মোহর কী আমরা লুট করে এনেছি নাকি?

গৌর হেসে ফেলল— লুট তো বটেই। গুপ্তধন যে পায় তার হয় নাকি কখনও। ও তো সরকারের সম্পত্তি। থানায় গিয়ে জমা দিতে হয়, তোমরা জানতে না? তোমাদের পিছনে এখন ডাকাত লেগেছে, ডাকাতদের পিছু পিছু পুলিশও আসবে।

একথা শুনে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে লেগে গেল।

গৌর এই সুযোগে একহাতে কান চেপে গান ধরল—

মোহর এনে সঙ্গে ডাকাত পুলিশ

ঘরে কেন তুলিস—

নিজের গাঁয়ে নিজের ঘরে নিজের জনের সাথে
মনের সুখে থাক না রে শাক-ভাতে

পরদিন সকাল থেকে গ্রামে এমন হইচই লেগে গেল যে মনে হয় আজ বুঝি এখানে রথের মেলা বসবে কিংবা দুর্গাপুজোর আজ পঞ্চমী, অথবা দুপুর থেকেই ঈদের দাওয়াত শুরু হয়ে যাবে ।

গ্রামের মানুষ ভোর না হতেই দূরের দিঘিতে ঝপাঝপ ক'টা ডুব দিয়ে এসে সেই যে কলা-উৎসবের হাজারো কাজে মেতে উঠেছে তার আর বিরাম নেই । কেউ ঘরের দেওয়ালে, দাওয়ায়, উঠোনে পিটুলিগোলা দিয়ে আলপনা দিচ্ছে, কেউ আগের রাতে ভেজানো চাল বা ডাল বাটতে লেগেছে, কেউ কলাপাতা বিছিয়ে তার ওপর খোসা-ছাড়ানো কলার স্তূপ সাজাচ্ছে, কেউ নারকোল কুড়িয়ে সবুজ কলাপাতার ওপর সাদা পাহাড় তুলছে, কেউ চালবাটা বা ডালবাটার সঙ্গে কলা নারকোল চটকে তাতে দই বা জল মিশিয়ে বাঁশের নলিতে পুরে আগুনে পোড়াচ্ছে, কেউ গুড় আটা মেখে পাকা কলার বড়া ভাজছে, কেউ ক্ষীর নারকোল দিয়ে কলার পিঠে গড়ছে, কেউ বানাচ্ছে কলার শরবত, কেউ কাঠের অল্প আঁচে রাঁধছে কলার পায়েস— কলার নানারকম মিষ্টি তৈরির সুগন্ধে সারা গ্রাম যেন ম-ম করছে ।



ছোটদের আনন্দের আর শেষ নেই । আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ আসছে দলে দলে ।

এত রকম কলার মিষ্টি চোখে দেখা তো দূরের কথা, কেউ কখনও শোনেওনি ।

গ্রামে যেন মানুষের ঢল নেমেছে । আশপাশের আট-দশটা গ্রাম থেকে লোক আসছে তো আসছেই । যতটা পেরেছে সেজেগুজে আসছে সবাই । একসময় সূর্য আকাশের কিনারে কলাখেতের আড়ালে ডুবে যেতেই ঝপ করে সন্ধে নামল ।

কারও ঘর থেকে বেরল কেরাসিনের লম্প, কারও ঘরে ছিল হ্যারিকেন, হেড মিস্তিরির বউ আনল একটা হ্যাজাক, কেউ কেউ কার্বাইড গ্যাস ভরে লম্বা বাতি জ্বালাল, সব দিয়েও অন্ধকার অল্পই দূর হল, বরং লোকজনের লম্বা লম্বা ছায়ার দৌড়োদৌড়িতে অন্ধকারটাই আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল ।



দূরের মাঠ পেরিয়ে তখনও যারা নেমন্তন্ন খেতে আসছে তাদের সঙ্গের হ্যারিকেন বা হ্যাজাক বা মশালের আলো থেকেও মাঠ ভরে আলোর চেয়ে কালো ছায়ার নাচানাচি বেশি দেখা যাচ্ছে ।

রাজমিস্তিরি-পাড়ায় কিন্তু অন্ধকার ছাপিয়ে আনন্দের ঢেউ । ঘরে ঘরে এত আনন্দ, উঠোনভরা এমন হই-হুল্লোড় এগ্রামে কেউ কখনও দেখেনি ।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই যে যার গ্রামে ফিরে গেলেও তখনও অতিথিদের যাওয়া-আসা থামেনি ।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে একটা বড় দল হাতের আলোয় মাঠের অন্ধকার নাচাতে নাচাতে এগিয়ে আসছে । গৌর এর মধ্যেই হেডমিস্তিরির মা ও আরও কয়েকজন কলাচাষির কথায় একটা যজ্ঞিডুমুর গাছের নিচু ডালে বসে কানে হাত চেপে রামায়ণগান গেয়ে চলেছে—

সীতা চুরির দোষে

রাবণ পড়ল রামের রোষে

রাজা হয়েও সেই পাপে তার যা ছিল সব খোয়ালো

লোভের ছদ্মবেশে কেউটে বিষদাঁতটি ছোঁয়ালো ।

রাজমিস্তিরি-পাড়ার আকাশ কাঁপিয়ে, বাতাস ঝাঁকিয়ে গৌর তার গানের কথা ও সুর হাওয়ার টানে ঘুড়ির সুতো ছাড়ার মতো ছেড়েই চলেছে, গ্রামের মানুষ কেউ খেতে-খেতে, কেউ খাওয়া থামিয়ে গান শুনছে, হঠাৎ সামনের মাঠে যেন আগুন ধরিয়ে মশাল নাচাতে নাচাতে একদল লোক এসে সবাইকে ঘিরে ফেলল ।

— কেউ নড়বি না! কেউ পালাবি না! পালাবার চেষ্টা করলে মুণ্ডুটা রেখে যেতে হবে । — বলে সবাইকে শাসাতে শাসাতে ডাকাতদের সর্দার যজ্ঞিডুমুর গাছের নিচু ডাল থেকে এক হ্যাঁচকায় গৌরকে মাটিতে নামিয়ে আনল ।

গৌর খুব বিরক্ত হয়ে বলল, এ কেমন ব্যভার আপনার? গানটাও গাইতে দিলেন না!

এবার সর্দারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল— মোহর কোথায়?

সঙ্গে সর্দারের হুংকার— ভেবেছিলি ফাঁকি দিবি? এদের ঠকিয়ে মোহরের হদিশ জেনে নিজেই সব ঝেড়ে দিয়ে কেটে পড়বি!

— আমি ফাঁকি দিতেও জানি না, কাউকে ঠকাতেও শিখিনি । তা বাদে, অন্যের জিনিস নিয়ে পালাতেই বা যাব কেন?

ভিড় ঠেলে পচা সর্দারের কাছে এসে বলল, গৌর ঠিক বলেছে, আমি তার সাক্ষী ।

এদিক-ওদিক থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে । অনেকেই ডুকরে কাঁদছে । দু-তিনটি মেয়েলি গলায় চিলের মতো তীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজ ।

গৌর ওই অবস্থায় গলা তুলে বলল, এনারাও আজ গাঁয়ের অতিথি । কলাপাতায় এনাদের মিষ্টি সাজিয়ে দাও । তোমাদের নারকোল-কলার নাড়ু খেলে শিবঠাকুরও তুষ্ট হবেন ।

— ওসব যাত্রাপালা অন্যদের দেখাস । সবাই বিষের নাড়ু খেয়ে চোখ ওলটাই আর কী! বের কর মোহরের কলসি ।

গৌর একইভাবে বলল, তোমাদের যার যা মোহর আছে, মিষ্টির সঙ্গে আলাদা কলাপাতায় সাজিয়ে দিও ।

সর্দারের হুকুমে দলের সবাই হাতের মশাল ঝুঁকিয়ে দেখল মিষ্টির পাহাড়ের পাশে আলাদা পাতায় সারি সারি মোহর ।

মোহর পেয়ে ডাকাতের দল মহা খুশি । সবাই মিলে কলার তৈরি মিষ্টি খেয়ে, যেসব মিষ্টির নামই শোনেনি, বার বার সেসব মিষ্টির তারিফ করে ডাকাতরা গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় সর্দার একটা মোহর গৌরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এটা তোর জন্য । তোর পুরস্কার ।

— এ শেয়ালের গু মানুষের কাজে লাগে নাকি! এ নিয়ে আমি কী করব? আপনারাই বরং মাথায় করে নিয়ে যান ।

গৌরের গান যেখানে থেমে গিয়েছিল, ডাকাতের দল চলে যেতে সেখান থেকেই গৌর আবার শুরু করল—

লংকা দেশের রাজা হয়েও যা ছিল সব খোয়ালো

লোভের ছদ্মবেশে কেউটে বিষদাঁতটি ছোঁয়ালো

দুঃখ-ভয়ের রাতটি এবার পোয়ালো ।

তখনও যেসব ঘর থেকে কান্নার শব্দ উঠছিল, তাও ক্রমশ গানের সুরে কথায় মিলিয়ে গেল । গানের মধ্যেই একসময় দূরের কলাখেত থেকে বন্দুকের আওয়াজ আর মানুষের আর্তনাদ রাজমিস্তিরি-পাড়া পর্যন্ত ভেসে আসায় গৌরকে আবারও গান থামাতে হল । তাছাড়া রাতও আর বেশি বাকি নেই ।

ভোরবেলা সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে যে যার ঘরে ঘুমে কাদা, সেইসময় দরজায় দরজায় লাঠির ঘা বুটের লাথির শব্দে গ্রামখানা আতংকে জেগে উঠল । অনেক ঘরের দরজা খুলে গেছে, অনেকের দরজা ভাঙা, সামনে বিরাট পুলিশবাহিনী ।

৪

সেপাইরা প্রথমে সবাইকে একলাইনে দাঁড় করিয়ে দিল। সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দারোগা প্রত্যেককে হুমকি দিল— বাকি মোহর কোথায় রেখেছিস, বের কর।

গৌর গায়ের উর্দি দেখে যাকে দারোগা ধরে নিয়েছে, তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বলল, আজ্ঞে, একটা কথা বলব দারোগাবাবু!

— তুই কে?

— আজ্ঞে আমি গৌর, গান গেয়ে বেড়াই।

— এখানে তোর বাপ কে? মা কে?

— তেনারা আমার শিশুকালে স্বগ্যে গেছেন। বাপ-মাকে বুকে নিয়েই বেরিয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে যেদিন যেখানে একমুঠো জোটে খেয়ে নিজের কাঁথাটি গায়ে দিয়ে বাপ-মা'র মুখ দুখানি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।



দারোগার সন্দেহ পুরো যায় না। তিনি কিছু বলবার আগেই গৌর আবার বলল, গাঁয়ের মানুষ ডাকাতের ভয়েই মরে আছে দারোগাবাবু। মানকুণ্ডুর রাজবাড়ি ভাঙবার সময় এরা যে যতটা পারে মোহর এনে লুকিয়ে রেখেছিল। ডাকাতরা এসে সব নিয়ে গেছে।

— সেগুলো এখন আমাদের হাতে। এগুলো যে এখান থেকেই নিয়েছে তাও কবুল করেছে। এখন জানা দরকার বাকি মোহর কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?

সকলেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না দারোগাবাবু, আর একটাও নেই। আমাদের মোহর লুকনোর গর্ত আমাদের দিয়েই খুঁড়িয়ে সব মোহর ডাকাতরা বের করে নিয়েছে।

— বেশ, আমার সেপাইদের সেসব গর্ত দেখিয়ে দে, ওরাও একবার হাত চালিয়ে দেখে নেবে।

দারোগা নিজেও গ্রামের পিছনের ঝোপঝাড়, পশ্চিমের পুকুরপার, বড় বড় আমলকী, নাগকেশর, যজ্ঞিডুমুর গাছের তলায় এগারো সেলের টর্চ ফেলে মোহর বা মোহরের গর্ত খুঁজে বেড়াল।

সারাদিনের ধকলের পর শেষরাতে একটু ঘুমোতে গিয়ে মানুষের এ কী অশান্তি! গৌর আর থাকতে না পেরে বিষণ্ণ গলায় গান ধরল—

ডাকাত এসে মোহর নিল
পাপ থেকে আজ মুক্তি দিল
তবু পুলিশ ধরল এসে তোদের
মোহর তো ভাই বিষমাখানো বোঁদে

লোভের বাসা বানাসনি রে মাথা
চাদ্দিকেতে লোভের ফাঁদটি পাতা
লোভের ছদ্মবেশে কেউটে বিষদাঁতটি ছোঁয়ালে
দুধেল গাইও ছটফটিয়ে মরে থাকবে গোয়ালে

ও রে সীতা-চুরির দোষে
রাবণ পড়ল রামের রোষে
লোভের ছদ্মবেশে কেউটে বিষদাঁতটি ছোঁয়ালো
রাজা হয়েও সেই পাপে সে যা ছিল সব খোয়ালো।

— তোর গলাটা তো চমৎকার। গানটাও অর্থবহ। আর-একবার গা তো—

গৌর এবার উৎসাহ-ভরে পুরো গানটাই গাইতে লাগল।

সেপাইরা কেউ কোথাও আর কিছু পায়নি, তবু দু-তিনজন দুয়েকটা নতুন গর্তে হাত ঢুকিয়ে দেখছে যদি দুটো একটা মোহর তখনও থেকে থাকে। মনে হয় বৃথা চেষ্টা। তার

ওপর গৌরের গানেও বোধহয় দারোগার মনটা নরম হয়ে ছিল, সঙ্গের সেপাইদের ডেকে বললে, চলো হে, ডাকাতগুলোকে কাল কোর্টে চালান করার ব্যবস্থা করতে হবে । থানার গারদে বেশিক্ষণ থাকলে গারদ ভাঙতে সর্দারটার বেশিক্ষণ লাগবে না । একাজে ওর সুনাম আছে ।



গ্রাম থেকে পুলিশবাহিনীর বের হবার মুখে, একটা রোগা চেহারার সেপাই দৌড়োতে দৌড়োতে এসে দারোগাকে বলল, এই দেখুন ছ্যার, পাঁচটা মোহর লুকিয়ে রেখেছিল, গর্তে হাত ঢোকাতেই একটা বেজি বেরিয়ে এসে আমার গায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাতেই আমার সন্দেহ হল । সেই বেজির গর্তে ছিল এগুলো ।

হেডমিস্তিরি পুলিশদের চলে যাওয়া দেখতে এগিয়ে এসে দারোগার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বেজিটা তার পা বেয়ে পিঠ বেয়ে কাঁধে উঠে বসতেই রোগা সেপাইটা গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠল— এই সেই বেজিটা ছ্যার! সেই বেজি! মালিকের কাঁধে উঠেই কেমন নিশ্চিন্দির ঘুম লাগল দেখুন ছ্যার!

হেডমিস্তিরিকে হাতকড়া পরিয়ে দুজন সেপাই টানতে টানতে নিয়ে চলল । দিনের আলো ফোটবার মুখে, তারা যখন কলাখেতের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, তখনও তার গলা ফাটানো কান্নার ভাঙা ভাঙা মৃদু শব্দ ভোরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ।



বেলা বাড়লে রাজমিস্তিরি-পাড়ার লোকেদের অনেক কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও গৌর গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল । সে জানে না এবার কোন দিকে যাবে । কিন্তু এ গ্রামে আর একদিনও থাকতে তার মন চাইল না ।

কলাখেতের মধ্যে চেনা পথে কিছুটা এগিয়ে সে একটা অচেনা দিক ধরে চলতে লাগল ।

হাঁটতে হাঁটতে বেলা পড়ে এল, সারি সারি কলাগাছের ছায়া যেখানে যতটুকু ফাঁকা পেল, মাটিতে লম্বা হয়ে লুটিয়ে পড়ল । এক জায়গায় গা-জড়াজড়ি অনেকগুলো কলাগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গৌরকে চমকে দিয়ে পচা একগাল হেসে বলল, পুলিশ ধরবার আগেই আমি সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে ডাকাতের দল ছেড়ে দিয়েছি । আমি তোমার সঙ্গে থাকব । কালকের গানটা একবার গাইবে? ওই যে— লোভ হল গো কেরাছিনের ইসটোভ ।

জীবনে এই প্রথম গৌর গানের অনুরোধ শুনেও গান গাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার সঙ্গে থেকে আপনার সুখ হবে না। কবে কোথায় কোনদিকে যাই তার তো ঠিক নেই।

পচাকে কেউ কখনও দুঃখ পেতে দেখেনি, আজ কিন্তু তার মুখে তার মনের দুঃখের ছায়া পড়ল। সে নরম গলায় বলল, আমায় তুমি সঙ্গে না নিলে আমি ঠিক মরে যাব।

তার গলা কান্নায় বুজে এল। তার মধ্যেই বলল, আমি আর চুরি-ডাকাতি করব না।

—আপনি নিজের গাঁয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে যান, সেখানে আপনার অনেক কাজ। বলে এবার গৌর অভ্যেসমতো এক হাতে কান চেপে গান ধরল—

এই যে আপনি দুঃখ পেলেন
নিজের পথ তো পেয়েই গেলেন
ঘরে আজও মা কাঁদছেন বসে
বাবা-দাদার দিন কাটে আপশোসে

ঘরে ফিরুন, নামছে সন্দে
জীবন কাটান সহজ আনন্দে

গানটা গাইতে গাইতেই গৌর পচাকে ছেড়ে অন্যদিকে হাঁটা লাগাল।

গৌরকে আমি পেলাম কীভাবে

বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা । একদিন দুপুরে ইংরিজি সাহিত্যের বিদুষী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য আমার বন্ধু, বিশ্বসাহিত্যের আশ্চর্য সব কিশোরগ্রন্থের বিখ্যাত অনুবাদক ও অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর নতুন কিশোর পত্রিকা 'লালকমল নীলকমল'-এর জন্য একটা গল্প লেখার ভার দিয়ে বসলেন । ভার তো দিলেন, কিন্তু আমার লেখার কী আর অত ধার আছে যে বসলাম আর লিখে ফেললাম । অফিসের কাজের ব্যস্ততায় লেখার কথাটা যতই ভুলে থাকার চেষ্টা করি, শেষপর্যন্ত বার বার টেলিফোনের তাগাদায় এক রাতে গৌরের গল্প লিখে ফেললাম । শুধু প্রথম অংশটা নিয়ে পাঁচ-ছ'পাতার ছোট্ট একটা গল্প ।

এর কয়েক বছর পর, ১৯৮৭ সালের শীতের এক বিকেলে, অফিসের কাজে দিল্লির প্লেন ধরবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক ও শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর টেলিফোন । প্রতিক্ষণ প্রকাশনী থেকে সামনের বইমেলায় আমার একটা ছোটদের বই বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বই বের করার সিদ্ধান্ত হলেই বইটাও যে লেখা হয়ে যায় না, এই সহজ যুক্তিটাই আমাকে দিতে হল । তাছাড়া ফ্লাইট মিস করার আশংকাও বুঝিয়ে বললাম ।

'বাজে কথা রাখো । এই নাও, প্রিয়ব্রত তোমার সঙ্গে কথা বলবে ।' ভাবখানা— বোঝো এবার ঠ্যালা!

প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ প্রকাশনীর কর্ণধার, সাদামাটা ভাষায় এককথায় জানালেন, 'বইয়ের নামটা বলে যান । প্লেনে উঠে গল্পটার কথা ভাবুন । আমরা প্রচ্ছদটা করিয়ে রাখি ।'

পরদিন দিল্লি থেকে ফিরে যতবার যত ভাবেই 'না' 'না' করি, পূর্ণেন্দুদাও ততই নাছোড়বান্দা । অতএব গৌরের আরও দুটো অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন দুটো পরিচ্ছেদ ।

ইতিমধ্যে কোত্থেকে খবর পেয়ে 'আজকাল'-এর তখনকার চমৎকার 'ছোটদের পাতা'র সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতির নন্দী সোজা দাবি করে বসলেন, বই হবার আগে গৌরের গল্প তক্ষুনি তাকে দিতে হবে, প্রথমে 'ছোটদের পাতা'য় ধারাবাহিক ছাপা হবে । লেখাটা প্রতিক্ষণের জন্য, বইমেলারও খুব আর দেরি নেই, এখন ধারাবাহিক প্রকাশের সময়

কোথায়? ধ্রুবজ্যোতির উত্তর, বইমেলার আগেই 'আজকাল'-এ ছাপা হবে, কয়েক সংখ্যা ধরে ছাপাবার সময় না থাকলে, এক সংখ্যায় যতটা আঁটে ততটাই ছাপা হবে । ধ্রুবজ্যোতির লেখাটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেল ।

পরদিন এসে বলল, লেখাটা জোর করে শেষ করে দিলেন কেন? গৌরের জীবনে আরও ঘটনা তো ঘটবেই । সেটা লিখে ফেলুন । আমি দু-তিনদিন পরে এসে নিয়ে যাব ।

অতএব চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বই হবার বোধহয় পরের বছর বিশ্বভারতীতে আগের বছরের শ্রেষ্ঠ ছোটদের বইয়ের জন্য পুরস্কার নেবার সময় 'গৌর যাযাবর' প্রসঙ্গে আমার লেখার অক্ষমতা বিনীতভাবে আমাকে বিবৃতি করতে শুনে সভায় উপস্থিত গুণীজনদের একজন পরে আমাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন, বইটিকে এভাবে যদি আপনি তুচ্ছ করতে থাকেন তাহলে যাঁরা এ-বই পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেছেন তাঁদের কী মনে হবে? এ তো তাঁদের রুচির প্রতিই আপনার অনাস্থার প্রকাশ । ভর্ৎসনাকারী আর কেউ নন, স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ । তাঁর এই কথা শোনার পর এ বই নিয়ে আমি আর কখনও কোনও কথা বলিনি । বরং গৌর যাযাবরের জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনি নিয়ে পঁচিশ বছর পর 'ছেলেবেলা'র জন্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ লিখতে হল ।